১৮৫৭ ও বাংলাদেশ

[illegible]কুমার মিত্র

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ১২

ফেব্রুয়ারি ১৯৬০

প্রকাশক :

সুরেন দত্ত

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা ১২

মুদ্রক :

সুনীল কুন্দগ্রামী

গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিঃ

৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট

কলিকাতা ১৬

প্রচ্ছদ :

খালেদ চৌধুরী

দাম : দু টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

উৎসর্গ

দেশ ও দেশবাসীকে ভালবাসতে এবং বিদেশী
শাসন ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রামে
বাল্যকাল থেকে যাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন
লাভ করেছি আমার সেই দিদিমার
স্মৃতির উদ্দেশে অর্পিত হল।

—লেখক

সূচীপত্র

ভূমিকা

সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও ঐতিহাসিকদের সুপরিকল্পিত প্রচারের ফলে "সিপাহী বিদ্রোহ" নামেই ভারতীয় মহাবিদ্রোহ আমাদের কাছে পরিচিত। এই মহাবিদ্রোহের রূপ ও তাৎপর্য নিয়ে এখনও গুরুতর মতভেদ বিদ্যমান। এ ছাড়া বাংলা দেশের উপর এই মহাবিদ্রোহের প্রভাব কতটা পড়েছিল এ নিয়েও বিতর্কের অবধি নেই। গত দু'বছর ধরে বাংলা ভাষায় এই বিষয় নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন এবং এখনও নানা প্রসঙ্গে করছেন তাঁদের মোটামুটি তিনটি পক্ষে ভাগ করা যায়। প্রথম পক্ষে আছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীহরিদাস মজুমদার প্রমুখ সুধীবৃন্দ। শ্রীবিনয় ঘোষও মতামতের দিক থেকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মূলতঃ প্রথম পক্ষভুক্ত। এইপক্ষ বাংলা দেশের উপর, বিশেষ করে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উপর মহাবিদ্রোহের কোন প্রভাবই স্বীকার করেন না। দ্বিতীয় পক্ষে আছেন শ্রীগোপাল হালদার। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণী "সমাজে, ধর্মে সংস্কার-বিমুখ ফিউডাল নেতৃত্বের জাতীয় বিদ্রোহকে যে" অনুমোদন করতে পারে নি এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই। "কিন্তু তাই বলে এই সংস্কারপন্থী বাঙালী শিক্ষিতদের মনে যে উত্তর ভারতের বিদ্রোহ স্পর্শ করেনি বা পরে কোনকালে করল না, এমন কথা বলা সম্ভব নয়"—এ কথাও গোপাল হালদার বলেন (পারিচয়, মাঘ, ১৩৬৪)।

তৃতীয় পক্ষভুক্ত হলেন অধ্যাপক সুশোভন সরকার, অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ প্রমুখ ইতিহাসবিদগণ। এঁরা বাঙালী শিক্ষিত মধ্য ও মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করে "জাতীয় অভ্যুত্থানের উত্তাল তরঙ্গে ভারতবর্ষ যখন আন্দোলিত" তখন "বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের নীরব নিষ্ক্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। (পরিচয়, সিপাহী বিদ্রোহ স্মারক সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৬৪) এঁদের সকলের লেখাই আমি যথাসাধ্য যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে পড়েছি। পড়ে আমার মনে হয়েছে যে,

বাংলা দেশে অন্ততঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে মহাবিদ্রোহের প্রভাব যে ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার সমস্ত তথ্য এঁরা অনুধাবন বা সংগ্রহ করার সুযোগ বা অবসর পান নি। আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তা সাজিয়ে-গুছিয়ে এই গ্রন্থে আমি সকলের সামনে পেশ করার চেষ্টা করেছি।

শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার প্রমুখ সুধীবৃন্দ মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা কালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত ও মন্তব্য করেছেন। এই সমস্ত ইঙ্গিত ও মন্তব্যের কোন কোনটি আমি অনুসরণ করে তথ্যাদির সাহায্যে দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্তের আকার দেবারও চেষ্টা করেছি। এ-সকল ব্যাপারে আমি কোন মৌলিকত্বের দাবি করি না।

সাহিত্যের তথ্যাদি নিয়ে আলোচনাকালে স্বভাবতই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করতেও আমি বাধ্য হয়েছি। অতি সংক্ষেপে এই আলোচনা সারতে হয়েছে, নইলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পেত। মহাবিদ্রোহ সংক্রান্ত আলোচনায় ১৭৫৭ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং মধ্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। এ নিয়ে ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার বাসনা রইল। অতি সংক্ষেপে হলেও এই সকল বিষয়ে এই গ্রন্থে আমি আমার মতামত কিছু কিছু ব্যক্ত করেছি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমি যে তত্ত্বটি উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি তা' হল এই যে, উত্তর ও উত্তরপূর্ব ভারতে মহাবিদ্রোহ এবং বাংলা দেশে শিক্ষিত মধ্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন পরিবেশে এবং ভিন্ন অবস্থায় বিদেশী শাসকদের অত্যাচার ও শোষণের ফলে একদিকে জ্বলে ওঠে মহাবিদ্রোহের আগুন, আর একদিকে শুরু হয় নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন—যে আন্দোলন ক্রমেই সশস্ত্র বিদ্রোহের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। শুধু বুর্জোয়া ভাবাদর্শ প্রভৃতি গৌণ সাবজেকটিভ কারণে

নয়, বাস্তব ঐতিহাসিক কারণেই বাংলা দেশের শিক্ষিত মধ্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী মহাবিদ্রোহে সক্রিয় সমর্থন জানাতে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীরা একটা দেশকে উপনিবেশ অথবা অর্ধ-উপনিবেশে পরিণত করার জন্য সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যে ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করেছে (চীনের ক্ষেত্রে) সেগুলির তালিকা দিতে গিয়ে চীনের কামউনিস্ট নেতা মাও সে-তুং যে কথা বলেছেন সে কথাও মনে রাখা দরকার। মাও সে-তুং লিখেছেন :

"এ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনা জাতির মনকে বিষিয়ে দেবার চেষ্টা অর্থাৎ সাংস্কৃতিক আক্রমণের কর্মনীতি কার্যকর করার চেষ্টা কখনও শ্লথ করেনি। মিশনারী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া, হাসপাতাল ও স্কুল স্থাপন করা, সংবাদপত্র প্রকাশ করা এবং চীনা ছাত্রদের বিদেশে পড়তে যেতে প্রলুব্ধ করার পন্থাগুলির মাধ্যমে এই কর্মনীতি কার্যকরী করা হয়। তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বুদ্ধিজীবীদের তৈরি করা এবং চীনা জাতির বিপুল সংখ্যক জনগণকে বোকা বানানোই তাদের লক্ষ্য।" (সিলেক্টেড ওয়ার্কস অব মাও সে-তুং, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮০)

বিদেশী শাসনের যে বিষক্রিয়া আজও আমাদের মনোজগতে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বর্তমান তা' শতাধিক বৎসর পূর্বে কত প্রবল ছিল সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

আর যে স্বদেশী মুৎসুদ্দী-বেনিয়ান শ্রেণী থেকে বাংলার স্বদেশী ধনিক শ্রেণীর অঙ্কুর উদ্গত হয়েছিল বিদেশী শাসকের, তথা বাণিজ্য-নির্ভর ধনিক গোষ্ঠীর উপর তার একান্ত নির্ভরতার কথা তো স্মরণ রাখতেই হবে। আর এরই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, ইতিহাসের নিয়ম অনতিক্রমনীয় এবং ইতিহাসের গতিও দুর্বার, তাই বিদেশী শাসকগোষ্ঠী যাদের হাতের পুতুল করে রাখতে চেয়েছিল তারাই রুখে দাঁড়িয়েছিল শেষ পর্যন্ত সেই বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে। সেখানেও শেষ হয়নি ইতিহাস, তার অগ্রগতি আজও অব্যাহত, নব নব দিগন্ত উন্মোচিত করে তার অভিযান চলেছে অপ্রতিহত গতিতে নতুন সূর্যোদয়ের দিকে।

এই গ্রন্থের আলোচনা উনিশ শতকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কাজেই 'মিড্‌ল ক্লাস' এই ইংরাজী পরিভাষাটি তখন যে অর্থে ব্যবহৃত হত সেই অর্থেই অর্থাৎ ধনিক-শ্রেণী (বুর্জোয়া) অর্থেই আমি ব্যবহার করেছি। 'মধ্যবিত্ত-শ্রেণী' আমি 'পেতি-বুর্জোয়া' অর্থেই ব্যবহার করেছি। 'মধ্যবিত্ত-শ্রেণী' অর্থে ধনিক শ্রেণী না বুঝালে 'নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী'র কথাটির কোন অর্থই হয় না, 'নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী' কথাটি ব্যবহার করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।

পেতি-বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বিরাট অংশ গত ৫০ বৎসরে কিভাবে 'কর্মচারী' নামের আবরণে দ্রুত সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে তা তো আমরা প্রত্যক্ষই করছি! বিংশ শতকের মধ্যভাগে তাই পেতি-বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত, তথা 'মিডল ক্লাস' শব্দটি ব্যবহার করা সম্পর্কেই প্রশ্ন উঠেছে। যাক, এ হল ভিন্ন প্রসঙ্গ।

আমার স্নেহভাজন সহকর্মী শ্রীঅরুণ রায়, শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরী, শ্রীকানাই পাকড়াশী এবং বন্ধুবর ডাঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা ও সরোজ-কুমার দত্ত এই গ্রন্থ রচনায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের সাহায্য না পেলে আমার কাজ শেষ হতে অনেক বিলম্ব ঘটত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীগণ সর্বপ্রযত্নে আমাকে সাহায্য করে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের উৎসাহেই এই গ্রন্থ শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হল। কিন্তু আমি জানি যে, তিনি আমার ধন্যবাদের প্রত্যাশী নন।

বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থে যথেষ্ট ভুলত্রুটি থেকে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। পাঠকরা সেগুলি দেখিয়ে দেবেন এই ভরসায় রইলাম।

—সুকুমার মিত্র

"এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে যা ছিল সৈন্যদের একটি বিদ্রোহ তা রাজনৈতিক কারণে ছড়িয়ে পড়ল উত্তর এবং মধ্য ভারতের বহু সংখ্যক মানুষের মধ্যে এবং তা পরিণত হল রাজনৈতিক বিদ্রোহে।

লর্ড ড্যালহৌসী কর্তৃক দ্রুত এবং বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তারে এই ধারণাই সৃষ্টি হয়েছিল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সর্বাত্মক জয় চায়, তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে কোন সন্ধির কোন মূল্য দেয় না এবং এদেশের কোন আইন-কানুনের পরোয়া করে না।"

—রমেশচন্দ্র দত্ত,

ইণ্ডিয়া ইন্ দি ভিক্টোরিয়ান এজ, পৃঃ ২২৩

১৮৫৭

সাহিত্য ইতিহাসের অন্যতম প্রধান সাক্ষ্য, কিন্তু একমাত্র নির্ভর-যোগ্য সাক্ষ্য নয়। শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের উপর (বিশেষ করে শাসক শক্তি যদি বিদেশী হয়) সাহিত্য অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। তুর্কী শাসনাধীন বাংলা দেশের একটা যুগে কোন সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না বলে সে যুগের ইতিহাস উদ্ধার করা যাবে না এমন কথা বলা চলে না, বলা হয়ও না। অ-সহযোগ আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে তেমন কোন চিহ্ন রেখে যায়নি বলে কি অ-সহযোগ আন্দোলন মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে?

তবু সাহিত্যের সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ এবং তা' যতটা পাওয়া যায় তা' নিশ্চয়ই সংগ্রহ করতে হবে। এবং প্রথমে বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সংগ্রহ করাই কর্তব্য।

১৮৫৬ খৃস্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়; কিন্তু শুধু আইন পাশ করে সমাজ-সংস্কার করা যায় না, তাই সংস্কারবাদী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লেখকদের মধ্যে অনেকে নাটকাদি রচনা করে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে উমেশচন্দ্র মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। উমেশচন্দ্রই প্রথম বিধবা বিবাহের সমর্থনে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে তাঁর 'বিধবা বিবাহ নাটক' প্রকাশ করলেন। এই নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণের ইংরাজী ভূমিকায় ভারতীয় মহাবিদ্রোহের উল্লেখ আছে। 'বিধবা বিবাহ' নাটকের দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু বাস্তবজীবনের কদর্য নগ্নরূপ উদ্‌ঘাটন করে শিমুয়েল পিরবক্‌সের ছয় অঙ্কের 'বিধবা বিরহ' নাটক প্রকাশিত

হয় ১৮৬০ খৃস্টাব্দে। এই নাটকটিতে ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য আছে। মন্তব্যটি নিম্নরূপ :

> ……সাগর মহাশয়ের ইহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি নাই ; তিনি যৎপরোনাস্তি সাধ্য পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন, কেবল যে তিনি একা তা নয় তাঁহার স্বপক্ষ বর্ধমানের মহারাজা ও কলিকাতার অনেক ২ রাজা ও বাবুগণ ছিলেন ; ইঁহারা কি না করতে পারেন তবে এটা যে সিদ্ধ হল না সে কেবল আমরা যে অবলা বিধবা আমাদেরই ভাগ্যদোষ বলতে হয়। কেন না যখন এই বিধবা বিবাহের উদ্‌যোগ হতেছিল প্রায় সেই সময় দুষ্ট নিমকহারাম সিপাইগণ যাহারা এত বচ্ছর অবধি সন্তান-সন্ততির ন্যায় রাজ্যেতে প্রতিপালিত হইল একেবারে রাজ্য নিবার আশায় রাজবিদ্রোহী হয়ে উঠল। ……এখন চিরদুঃখিনী বিধবা যে আমরা, আমাদের কর্তব্য এই যে আমরা সতত ভগবান চন্দ্রের নিকট এই প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের মহারাণীকে জয়ী করেন আর দুষ্ট সিপাইগণকে নিপাত করিয়া দেশে কুশল দেন।

শিমুয়েল পিরবক্‌সের উল্লিখিত নাটকটির রচনাকাল ১৮৫৭-৫৮ খৃস্টাব্দ, কাজেই সমসাময়িক সংস্কারপন্থীদের এক দলের মত এতে প্রকাশ পেয়েছে এ কথা বলা চলে। কিন্তু হিন্দুদের বিধবা বিবাহ সম্পর্কে খ্রীস্টধর্মাবলম্বী একজন মুসলমান লেখকের মতামতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার কোন কারণ দেখা যায় না।

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের বিরুদ্ধে শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের মনোভাব কতটা তীব্র ছিল তা দেখানোর জন্য শ্রীসজনীকান্ত দাস "শনিবারের চিঠি"তে (শ্রাবণ, ১৩৬৪) যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) ছাড়া তিনি আর একটি লোকেরও নাম করতে পারেননি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে ইংরাজী জানতেন না এবং ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার উপর হাড়ে-চটা ছিলেন। কিন্তু ইংরাজ শাসনের উপর তাঁর অচলা ভক্তি ছিল। নীল-বিদ্রোহের সময় তাঁর এই অচলা ভক্তি অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়। এই সময়কার তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাগুলিই তার প্রমাণ।

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। তাঁর অনেক গুণ ছিল, বাংলা সাহিত্যে তাঁর এক বিশিষ্ট স্থান আছে, কিন্তু তাঁর মতামত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অথবা সাধারণ বাঙ্গালী মেনে নিয়েছিল এমন কথা মনে করার কোন কারণ নেই। নানাসাহেব, ঝান্সীর রাণী প্রভৃতি মহাবিদ্রোহের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর কুৎসিৎ কটাক্ষ কেউই অনুমোদন করেননি।

নানাসাহেব সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কতকাংশ নীচে উদ্ধৃত হল:

"কোথাকার মহাপাপ,
কোথাকার মহাপাপ, বলে বাপ,
পুত্র হল 'নানা'।
কাকের বাসায় যথা কোকিলের ছানা।
সেটা ত পুষ্যি এঁড়ে,
সেটা ত পুষ্যি এঁড়ে, দস্যি ভেড়ে
নস্যি কর তারে।
উঠে ধানে পস্তি যেন, না করিতে পারে

হলো সে হলোই হিন্দু,
হলো সে হলোই হিন্দু, দোষের সিন্ধু
দ্বেষানলে দহে।
গলে দোলে পাপের সূত্র, বাপের পুত্র নহে।"

অথবা,

"নানা পাপে পটু নানা, নাকি শুণে না, না।
অধর্মের অন্ধকারে হইয়াছে কানা॥
ভাল-দোষে ভাল তুমি ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু শেষে দেখ ফাঁদ॥"

'কানপুরের জয়' কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত ঝান্সীর রাণী সম্পর্কে জঘন্য মন্তব্য করেছেন :

"পিঁপীড়া ধরেছে ডানা মরিবার তরে।
হাদে কি শুনি বাণী ?
হাদে কি শুনি বাণী ঝান্সীর রাণী
ঠোঁটকাটা কাকী ॥
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি ?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি
নানা তার ঘরের ঢেঁকি মাগী খেঁকী
শেয়ালের দলে।
এতদিনে ধনে জনে যাবে রসাতলে।"

ঈশ্বর গুপ্ত বিধবা বিবাহ এবং মহাবিদ্রোহ অর্থাৎ সমাজ সংস্কার এবং রাজনৈতিক বিদ্রোহের প্রতি একান্ত বিরূপ ছিলেন। তাই, মহাবিদ্রোহের সময় প্রতিহিংসাপরায়ণ ইংরাজরা উত্তর ভারতের হাজার হাজার লোককে নির্বিচারে হত্যা করায় তাদের বিধবা স্ত্রীদের প্রতি সমবেদনা জানাতে গিয়েও ঈশ্বর গুপ্ত যা' লিখেছেন তা' নিষ্ঠুর পরিহাসের মতই শোনায়—

"বিদ্যাসাগর নাহি তথা। কে কবে বিয়ের কথা ॥
বিয়ে হলে বেঁচে যেত। সাধপুরে খেতে পেত ॥
গহনা উঠিত গায়। এড়াতো সকল দায় ॥"

ঈশ্বর গুপ্ত সমসাময়িক তরুণ লেখকদের গুরুস্থানীয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে যে সকল কথা বলে গেছেন তার অনেক কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য হলেও সব কথাই নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে ঈশ্বর গুপ্তের ইংরাজ প্রশস্তির উপর বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি, ফলে ঈশ্বর গুপ্তের "রাজনৈতিক মন উদার ছিল" অথবা ঈশ্বর গুপ্তের "ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই"—এই ধরণের অভিমত প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। রাজশক্তির প্রশস্তি চিরকালই

কেউ কেউ রচনা করে থাকেন, কিন্তু সেই প্রশস্তিতে জনমত অভিব্যক্ত হয়ে থাকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সত্যই হাস্যকর।

লক্ষ্মণ সেনের আমলে কবি উমাপতি ধর লক্ষ্মণ সেনের গৌরব গাথা গাইবার সঙ্গে সঙ্গে ম্লেচ্ছ রাজারও স্তুতিবাদ করেছিলেন। যে রাজা-মানসিংহকে হিন্দু লেখকরা রাজপুতকুলকলঙ্ক বলে বর্ণনা করেছেন সেই মানসিংহ ১৫৯৪ খৃস্টাব্দে দীর্ঘ বিশবছরব্যাপী অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার পর বাংলা দেশে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করলে কবি মুকুন্দরাম লিখেছিলেন :

"ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ-উৎকল অধিপ।
যে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ ॥"

আবার মাধব আচার্য 'চণ্ডীমঙ্গলে' লিখেছিলেন :

"একব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার"

কবিদের উল্লিখিত মতামত যদি জনমতের অভিব্যক্তি বলে গণ্য হয় তা হলে "কমলাকান্ত" অত কান্নাকাটি করলেন কেন ?

পলাশী রণক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র "কিছুই হারাননি" এবং "সিপাহীর যুদ্ধ তাই তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই, আর মধুসূদন, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র,—সিপাহীবিদ্রোহ এঁদের "কাহারও কল্পনাকে উদ্দীপিত করে নাই"—এই ধরণের সিদ্ধান্ত বাংলা সাহিত্যের জাতীয়তা-বোধের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে আদৌ সমর্থিত হয় না।

সবচেয়ে হাস্যকর হল বাংলা সাময়িক পত্রাদির সংবাদ ও মন্তব্যগুলিকে সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর মনোভাবের সাক্ষ্য-স্বরূপ হাজির করা। বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ এবং সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি বাংলা দেশের মানুষের, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন ক'টি বাংলা পত্রিকায় পেয়েছে ?

১৯০৫ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশের নাম-করা কাগজ-গুলির পৃষ্ঠা উল্টোলে বাঙ্গালী জাতির বিপ্লবী মনোভাবের কতটুকু পরিচয় পাওয়া যাবে? জাতীয় আন্দোলনে যখন পূর্ণ জোয়ার এসেছে তখনও বাংলাদেশের সংবাদপত্রসমূহের মালিক, সাংবাদিক ও লেখকদের যে কাজ করার সাহস হয় নি সে কাজ করার সাহসের অভাব যদি ভারতীয় মহাবিদ্রোহের যুগে বাংলা দেশের পত্রিকা-সম্পাদক ও লেখকদের হয়েই থাকে তবে তার জন্যে তাঁদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। তা' ছাড়া সে যুগে বাংলা পত্রিকাগুলির প্রভাবের তুলনায় ফারসী, উর্দু, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির প্রভাব বেশী ছাড়া কম ছিল না। মহাবিদ্রোহের সময় রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে ঐ সকল ভাষায় প্রকাশিত অনেকগুলি কাগজের প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, মহাবিদ্রোহের সময় বাংলাদেশে 'সমাচার-সুধাবর্ষণ' নামে অন্তত একটি দ্বিভাষিক (বাংলা ও হিন্দী) পত্রিকা রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল।

অবশ্য বিরুদ্ধ-পক্ষ কাগজে-কলমে বিশেষ কিছু প্রমাণ রেখে যাননি বলে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন হবে না যে বাঙ্গালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভারতীয় মহাবিদ্রোহের প্রতি সমর্থন জানিয়ে-ছিলেন। কিন্তু ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ইংরেজের কাছ থেকে শুধু সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখেছিলেন এমন কথা মনে করলে ভুল হবে। নিশ্চয়ই তাঁরা ইংরাজের রাজনীতি ও কূটনীতি বিদ্যাটুকুও আয়ত্ত করেছিলেন। এই রাজনীতি ও কূটনীতিই তাঁদের সতর্ক মৌনাবলম্বন করতে শিখিয়েছিল।

সেদিনের শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা অনিবার্য বলে জেনেছিলেন এবং সেই কারণেই সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি তাঁরা কোন সমর্থন জানাননি—এই ধরণের মতবাদও কোন তথ্যের

উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, ইংরাজ-রাজত্ব টিকতেও পারে নাও টিকতে পারে এই ধারণাই সেদিন প্রবল ছিল। যিনি "ইংরেজের নুন খাইয়া আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি" বলে জোর গলায় ঘোষণা করেছেন সেই একান্ত ইংরেজ-ভক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত স্বীকার করেছেন :

"সিপাহী বিদ্রোহ যে, কেবল বেরিলীতেই ঘটিয়াছিল তাহা নহে, ভারতের নানাস্থানে একইকালে এই বিদ্রোহানল ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠে। বঙ্গে, বিহারে, উত্তর-পশ্চিমে, অযোধ্যা লক্ষ্ণৌয়ে, পাঞ্জাবে, মধ্য ভারতে, যেন সর্বত্রই সমভাবে সম-সময়ে সকলেই গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল, —'ইংরেজ-রাজকে চাহিনা,—ইংরেজ-রাজ্য ধ্বংস কর ;—ইংরেজ দেখিলেই তাহার প্রাণবধ কর'।"

(আমার জীবনচরিত, দ্বিতীয় ভাগ প্রথম পরিচ্ছেদ,
জন্মভূমি—১২৯৮-১২৯৯, পৃঃ ৩২২)

সাধারণ বাঙ্গালী মহাবিদ্রোহের সময় কী নিদারুণ আতঙ্ক, উদ্বেগ এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটিয়েছিল তার বহু প্রমাণ কালীপ্রসন্ন সিংহ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির রচনাবলীর মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইংরেজ-নির্ভরতাই এর একমাত্র কারণ নয়। আসলে এ-সময় নবসৃষ্ট শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ ছিল না এবং বাংলাদেশে ধনিক শ্রেণীর যে অঙ্কুরটুকু দেখা দিয়েছিল তা' ইংরেজ শিল্পপতিদের দাপটে প্রায় শুকিয়ে এসেছিল (মনে রাখতে হবে ৩৩ খানি জাহাজের মালিক কোটিপতি রামদুলাল সরকার ১৮১৩ খৃস্টাব্দে সাধারণ ধনী ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছেন।) বাঙ্গালী মুৎসুদ্দী, বাঙ্গালী সওদাগর ব্যবসা-বিস্তার ও ধনসঞ্চয় করে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খৃস্টাব্দ মধ্যে যখন কিছুটা প্রবল হয়ে উঠেছেন ইংল্যাণ্ডের উদীয়মান শিল্পপতিগোষ্ঠী স্বদেশে ক্ষমতা দখলের অভিযান চালানর সঙ্গে সঙ্গে তখন তাঁদেরও সায়েস্তা করার ব্যবস্থা করেছেন। ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

এক ঢিলে তুই পাখী মারল। জমির মূল্য বাড়িয়ে জমির দিকে বাঙ্গালী ধনীদের আকৃষ্ট করে এই ব্যবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে বাঙ্গালী -ধনীদের ঝোঁক কমাল, আবার ইংরেজভক্ত এবং কৃষক-শোষণকারী এক ভূম্যধিকারী শ্রেণীও গড়ে তুলল। এতেই শেষ হল না। অসম প্রতিযোগিতার অস্ত্রও নির্বিচারে প্রয়োগ করা হল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বাধীনভাবে শিল্প-বাণিজ্যে বাঙ্গালীর উন্নতির কথা ভেবেছিলেন। স্বাধীন শিল্পপতিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "আমার পিতা ১৭৬৩ সালের পৌষমাসে য়ুরোপে প্রথমবার যান। তখন তাঁদের হাতে হুগলী, পাবনা, রাজসাহী, কটক, মেদিনীপুর, রঙপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী এবং নীলের কুঠি, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে।"

(শ্রীমমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত পৃ: ১০,
—১৮৯৮ খৃস্টাব্দে শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত।)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স যখন ৩০ বছর তখন এই বিরাট কারবারের পত্তন হল। শুধু দ্বারকানাথের অমিতব্যয়িতাকে কারবার নষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী করাটা একান্ত ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই না। সাহেব কোম্পানীর সঙ্গে হাত মিলিয়েও কারবার রাখা যায় নি। এর মূলে ছিল উদীয়মান ইংরেজ শিল্পপতিদের নীতি। এই নীতির স্বরূপ ধরা পড়েছিল দ্বারকানাথের চোখে, তাই ১৮৩৪ খৃস্টাব্দেই তিনি চরম ক্ষোভে বলেছিলেন—"ওরা দেশবাসীর সব কিছুই আত্মসাৎ করবে—জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি।" জনসাধারণের সঙ্গে যোগ নেই, আবার দেশীয় ধনিকশ্রেণীও মাথা তুলতে পারছে না, এই অবস্থায় বাঙ্গালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেরুদণ্ড শক্ত হবার কোন উপায় ছিল না। তাই মধ্যবিত্তের একাংশ রাজভক্তি প্রকাশে ব্যগ্র, বেশীর ভাগ সতর্ক মৌনাবলম্বনের পক্ষপাতী, কিছু লোক নিয়মতান্ত্রিক

উপায়ে ইংরেজ শাসনের গলদ দূর করে ক্রমে ক্রমে ক্ষমতালাভের প্রয়াসী।

কিন্তু এই 'ত্রিশঙ্কু' অবস্থার মধ্যেও বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের প্রভাবশালী ও প্রগতিশীল অংশ যে মনোভাব দেখিয়েছিলেন তার প্রশংসাই করতে হয়।

দীর্ঘ শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং পুনঃপুনঃ বিদ্রোহে বাঙ্গালীর ক্ষাত্রশক্তি নিঃশেষিতপ্রায়, বাঙ্গালী যোদ্ধারা পর্যুদস্ত, হৃতসর্বস্ব, বাংলা দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতেও মোটামুটি এই অবস্থাই ছিল। এই রকম অবস্থায় জনসাধারণ চঞ্চল হয়ে উঠলেও তাদের পক্ষে অস্ত্রধারণ করার কোন উপায় ছিল না, এর উপর বাংলা দেশের ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং উদীয়মান মধ্যশ্রেণী প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ইংরেজ শাসকশক্তির চাকরী ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। 'অনিবার্যতা' তত্ত্ব মেনে নিলে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের ত উদ্বাহু হয়ে ইংরেজ-প্রশস্তি গাওয়া এবং সিপাহী বিদ্রোহের পিণ্ডি চটকানোই উচিত ছিল, কারণ তাতে লাভের আশাই ছিল ষোল আনা। কিন্তু বিস্ময় ও গৌরবের বিষয় হল এই যে, 'গাঁওয়ার' সিপাহীদের (যুদ্ধ যারা করে তাদের কতজনই বা বুদ্ধিজীবী হয় এমনকি আজকের দিনেও? 'সুসভ্য' ইঙ্গ-মার্কিন ফৌজের কীর্তিকলাপ আমরাও যুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষ করেছি, কাজেই শতবর্ষ পূর্বের ভারতীয় সিপাইদের উপর বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীর একাংশের এত আক্রোশ কেন?) বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে সেদিনের শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের বড় এবং নেতৃস্থানীয় অংশ রাজী হননি। তাঁরা নীরব থাকাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। আর একটি কথাও এখানে মনে রাখা দরকার। ইংরেজ-সৃষ্ট নতুন সমাজের ভিত্তির অংশরূপে উদ্ভূত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের মোহভঙ্গের পালা শুরু হয়েছিল ১৮২৩-২৫ সাল থেকে [১]। অভিমান-অনুযোগ-সংশয় সন্দেহ ও ক্ষোভের পালা

১। লেখকের 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র' দ্রষ্টব্য।

শেষ হয়ে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত নিয়মতন্ত্রসম্মত গণ-বিক্ষোভের দিকে পা বাড়িয়েছিল ভারতীয় মহাবিদ্রোহের কালেই এবং মহাবিদ্রোহের পর এই পদক্ষেপ দ্রুততর হয়, কারণ বিদ্রোহীদের উপর ইংরেজদের নৃশংস প্রতিহিংসা, জনসাধারণের উপর পাশবিক অত্যাচার, বিদ্রোহে যোগদান না করা সত্বেও বাঙ্গালীদের উপর ইংরেজদের সন্দেহ ও প্রতিহিংসা গ্রহণের চেষ্টা বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের চোখ ফুটিয়ে দেয়। ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যে অস্ত্রধারণ করা সম্ভব এবং ইংরেজের ফৌজ যে অপরাজেয় নয় এই চেতনাও এই সময় জাগে। মূল ঐতিহাসিক সত্য হল্ এই যে, শুধু পুরাতন সামন্ততন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যেমন ভারতীয় মহাবিদ্রোহের কারণ নয় তেমনি শুধু বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগায়নি অথবা মহাবিদ্রোহ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখেনি। ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের ফলে এবং ইতিহাসের হাতিয়াররূপে তাদের অজ্ঞাতসারেই তারা ভারতে যে নতুন সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করছিল তারই অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ একদিকে ঘটেছিল বিরাট সশস্ত্র বিদ্রোহ, আর একদিকে ইংরেজ সৃষ্ট শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের মনে জেগেছিল অসন্তোষ, বিক্ষোভ এবং স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা।

ঐতিহাসিক কারণেই এই দুটি ধারার মধ্যে সেদিন মিলন ঘটেনি বটে, কিন্তু এ মিলন হতে খুব বিলম্ব হয়নি। ইতিহাসের এই রায় গ্রহণ করলে ভারতীয় মহাবিদ্রোহে শিক্ষিত বাঙ্গালী যোগ দেয়নি বা দিতে পারেনি বলে তাদের 'দেশদ্রোহী' সাব্যস্ত করা অথবা "সিপাহী বিদ্রোহ কুসংস্কারাচ্ছন্ন গাঁওয়ার সিপাহীদের কাণ্ড-কারখানা এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তাতে যোগ না দেওয়াটাই অনিবার্য ছিল" এই ধরণের অপসিদ্ধান্ত থেকে আমরা রেহাই পাব।

প্রকৃতপক্ষে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রীর এবং 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থে অজিত কুমার

চক্রবর্তীর মন্তব্য ঐ ধরণের অপসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন: "বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গ সমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়।

এই কালের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্ম সমাজের নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গ সমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল, প্রত্যেকটিরই ইতিবৃত্ত গভীর অভিনিবেশ সহকারে আলোচনার যোগ্য।"

(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ,
১৯৫৭ সালের সংস্করণ, পৃ: ২০২)

অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন: "দেবেন্দ্রনাথ যখন হিমালয় হইতে নামেন তখন সিপাহী বিদ্রোহ চলিতেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন শীঘ্র নিভিয়া গেল বটে, কিন্তু বাংলা দেশের মাটিতে তাহা একটা নূতন সার রাখিয়া গেল। এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সেই সময় হইতে শুরু। সিপাহী বিদ্রোহের আগুনের পরিণামস্বরূপ সারেই তাহার ফলন।"

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
দ্বিতীয় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ: ২১০)

বাঙ্গালী মধ্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে মতানৈক্য

[১]

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ যখন ঘটে তখন বাঙ্গালী মধ্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকলেই একমত হয়েছিলেন এমন কথা মনে করারও কোন কারণ নেই।

"প্রেসিডেন্সী শহরগুলির সংখ্যালঘু শিক্ষিত অল্পসংখ্যক লোক সরকারের সমাজসংস্কারমূলক আইনগুলিকে এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, কিন্তু উত্তর ভারতের জনৈক অধিবাসী কলকাতার বাবুদের পুরোদস্তুর ইংরেজীনবীশ এবং "কেবলমাত্র এটর্ণী-রূপে অথবা মিল্টন ও শেক্সপীয়র পড়ানোর শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হবার উপযুক্ত" বলে বিদ্রূপ করেছিলেন।[১] এই স্বল্পসংখ্যক সংখ্যালঘুরাও সরকারকে সমর্থন করার ব্যাপারে একমত ছিলেন না। বাংলাদেশের একজন শিক্ষিত হিন্দু অভিযোগ করেন যে "একশত বৎসরের সক্রিয় স্বৈরাচার যার কখনও লাঘব হয়নি এই এতটুকু উদারতার দ্বারা প্রশমিত হল না।"[২]

তিনি আরও বলেন যে, "পরস্পরের সঙ্গে শতাধিক বৎসরের পরিচয় হিন্দু এবং ইংরেজদের বন্ধুত্বে অথবা এমন কি শান্তিপ্রিয় সহবাসীতে পরিণত করে নি।"

(এইট্টিন-ফিফটি সেভেন—সুরেন্দ্রনাথ সেন পৃঃ ২৯)

১। The Thoughts of a Native of Northern India on the Rebellion. P 29

২। Causes of the Indian Revolt by a Hindu of Bengal, PP 18 & 21 Edited by Malcolm Lewin.

বাংলাদেশের ভূম্যধিকারী শ্রেণী আনুগত্য জানাবার জন্য উদগ্রীব থাকলেও শিক্ষিত মধ্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকলেই আগু বাড়িয়ে বিদেশী শাসকদের প্রতি আনুগত্য জানাতে যান নি।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশের নবোদ্ভূত মধ্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে তখনই নানা স্তর দেখা দিয়েছিল। বড় বড় জামদার এবং তাদের কাছাকাছি স্তরের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা প্রকাশ্যেই (তাও সকলে নয়) বিদ্রোহের নিন্দা করেছিলেন। এই নিন্দাও অনেক পরিমাণে কূটনীতি-সমুদ্ভূত একথা মনে করলে বোধহয় ভুল হবে না। আর একথাও মনে রাখা দরকার যে, বাংলার জমিদারদের নেতৃত্বে পরিচালিত বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ১৮৫৭ সালের ২২শে মে মীরাট ও দিল্লীর সিপাহীদের আচরণের নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করলেও বর্ধমানের মহারাজা ও অন্যান্য আড়াই হাজার নাগরিকের স্বাক্ষরিত আনুগত্যজ্ঞাপন পত্রটি ইংরেজ সরকারের কাছে প্রেরিত হয় দিল্লীর পতনের পর, তার আগে নয়।

ইংরেজ শাসনের প্রতি বাইরে সমর্থন জানিয়েও ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টাও দেখা যায়। বিত্তশালী শ্রেণীর আত্মরক্ষার নীতি এই পথ নেবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নাম করা যায়।

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সময় বাংলাদেশে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮) একজন খ্যাতনামা নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্য, রাজনীতিজ্ঞ, শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী দক্ষিণারঞ্জনের প্রভাব কলকাতা শহরে এ সময় বিশেষভাবেই অনুভূত হয়েছিল।

দক্ষিণারঞ্জনের জন্ম হয় তাঁর মাতামহ সূর্যকুমার ঠাকুরের বাড়ীতে ১৮১৪ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। সম্পর্কে দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাগ্নে।

দক্ষিণারঞ্জনের সামাজিক পরিবেশ কিরকম ছিল তা' বুঝবার জন্যই তাঁর উল্লিখিত পরিচয় দেওয়া হল। 'জ্ঞানান্বেষণে'র সম্পাদকরূপে

দক্ষিণারঞ্জন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য রীতিমত লড়ালড়ি করেন। 'চক্রবর্ত্তী দলের' (Chuckerbarty Faction—'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক মার্শমান তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ নব্য সংস্কারকগণকে এই নামে আখ্যাত করেন) অন্যতম বিশিষ্ট সদস্যরূপে দক্ষিণারঞ্জন ১৮৪৩ খৃস্টাব্দের ৮ই ফ্রেব্রুয়ারী 'জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা'র (Society for the Acquisition of General Knowledge) এক অধিবেশনে বাংলাদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিচার ব্যবস্থা ও পুলিস সম্পর্কে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন সেটিই হল তাঁর প্রথম রাজনীতিক বক্তৃতা। এই বক্তৃতা শুনে হিন্দু কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন অত্যন্ত বিচলিত হন এবং উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলেন, "আমি কোন মতেই এই কলেজকে বিদ্রোহীদের মন্ত্রণাগারে পরিণত হতে দিতে পারি না" (I cannot convert the college into a den of treason)।

জ্ঞানোপার্জিকা সভা রাজনীতির সভা ছিল, পরে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত বাগ্মী জর্জ টমসনের নেতৃত্বে (এঁকে দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারতে নিয়ে আসেন।) এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির উদ্যোগে 'বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে রাজনীতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হয় (২০ এপ্রিল, ১৮৪৩)।

দক্ষিণারঞ্জন বাংলা দেশের তৎকালীন শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে রাজনীতিকরূপে স্বল্পকালের মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ওকালতী করে এবং কলকাতার কালেক্টর ও মুর্শিদাবাদের দেওয়ানরূপে কাজ করে দক্ষিণারঞ্জন যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। বেথুন কলেজের জন্য জমি দান করে দক্ষিণারঞ্জন স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে বিশেষ সাহায্য করেন।

ক্রমে এককালের 'বিদ্রোহী' দক্ষিণারঞ্জন 'একান্ত অনুগত রাজভক্ত' বলে গণ্য হন এবং ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পর অযোধ্যার তালুকদারদের 'অনুগত প্রজারূপে' গড়ে তোলার জন্য দক্ষিণারঞ্জনকে বিদ্রোহী

তালুকদার রাজা বেণী-মাধোর তালুক অর্পণ করে তাঁকে অযোধ্যার অবৈতনিক সহকারী কমিশনার নিয়োগ করা হয়।

ডিরোজিওর জীবনচরিতকার টমাস এডওয়ার্ডস কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেছেন। দক্ষিণারঞ্জনের জীবনচরিতকার মন্মথনাথ ঘোষ কয়েকটি ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে এডওয়ার্ডস-এর বক্তব্য 'অমূলক অপবাদ' বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এডওয়ার্ডস-এর কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় বলে মনে হয় না।

এডওয়ার্ডস-এর মতে দক্ষিণারঞ্জন 'রাজভক্ত' ছিলেন না এবং চক্রান্তে পটু ছিলেন। ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সময় তিনি বিদ্রোহী-দের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখেছিলেন।

কথাটা মিথ্যা নাও হতে পারে। শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ইংরাজের রাজনীতি শিখেছে, অথচ কূটনীতি শেখেনি এমন কথা মনে করার কোন অর্থই হয় না।

দক্ষিণারঞ্জন কেন, বাংলা দেশের অনেক বিত্তশালী পরিবারই তখন ইংরাজের জয়লাভ সম্পর্কে খুব সুনিশ্চয় ছিলেন না। এ অবস্থায় 'চাচা আপন বাঁচা' নীতি অনুসরণ করা একান্তই স্বাভাবিক। কাজেই দক্ষিণারঞ্জন যদি ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার কথা ভেবেই থাকেন তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না এবং দক্ষিণারঞ্জনের মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। অবশ্য 'যাঁরা ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সময় সমস্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং ইংরাজশাসনের প্রগতিশীল পদ্ধতির পরিবর্তে পুরাতন মুঘল শাসনব্যবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার করে' একান্ত রাজভক্ত হয়ে বসেছিলেন মনে করেন, তাঁদের পক্ষে এডওয়ার্ডস-এর কথা মেনে নেওয়া মুস্কিল। টমাস্ এডওয়ার্ডস ডিরোজীওর জীবনচরিতে দক্ষিণারঞ্জন সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তা' নিম্নে উদ্ধৃত হল :—

"All his life Duckinaranjan Mookherjee lived in the midst of scheming and intrigues. In the incidents

that led up to the Mutiny and throughout its progress, the former pupil of Derozio schemed all round, at one time making overtures to some members of the Tagore family regarding certain designs of the King of Oudh, at another seemingly working hard as a loyal subject in the interests of England. All his manoeuvers during the period of the Sepoy Rebellion will probably never be revealed, but he had sufficient craft to make it appear to Duff and the officials of the Foreign Office that he was a highly deserving and loyal subject.

"Were the true state of matters revealed probably Duckinaranjan deserved something quite different to what the Government of India in it guileless liberality bestowed on him".

মর্মানুবাদ : সারা জীবন দক্ষিনারঞ্জন শুধু চক্রান্তই করেছেন। যে সব ঘটনাবলীর ফলে ফৌজী বিদ্রোহ ঘটে সেই সব ঘটনা এবং সমগ্র বিদ্রোহকালে ডিরোজীওর প্রাক্তন ছাত্র কেবল চক্রান্ত চালিয়ে যান। কখনও অযোধ্যার নবাবের পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি ঠাকুর পরিবারের কোন কোন লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছেন, আবার অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডের স্বার্থে অনুগত প্রজারূপে তিনি খুব কাজ করছেন দেখিয়েছেন। সিপাই বিদ্রোহের সময় তাঁর অভিলাষের কথা হয়ত কখনও জানা যাবে না, কিন্তু তিনি যে সত্যই অনুগত প্রজা এবং তাঁর আনুগত্যের জন্য পুরস্কার লাভের যোগ্য, ডাফ এবং বৈদেশিক দপ্তরের পদস্থ কর্মচারীদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করার মত চাতুর্য তাঁর যথেষ্ট ছিল। সত্যিকার অবস্থা কি ছিল তা যদি কখনও জানা যায় তবে দেখা যাবে ভারত সরকার সরল উদারতায় তাঁকে যে পুরস্কার দিয়েছিলেন তার বদলে সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ অন্য কিছুই তাঁর প্রাপ্য ছিল।

মন্মথবাবু যাই বলুন না কেন, এডোয়ার্ডস্ সাহেবের দক্ষিণারঞ্জনের উপর ব্যক্তিগত আক্রোশের কোন কারণ ছিল বলে মনে হয় না। কাজেই দক্ষিণারঞ্জন সম্পর্কে তাঁর মতামত একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'য় 'মিউটিনি' নামক রচনায় যে মন্তব্য করেছেন তাও স্মরণ করা দরকার। তিনি লিখেছেন, "কারু নিরপরাধে প্রাণদণ্ড হলো ; কেউ অপরাধী থেকেও জায়গীর পেলেন।"

[২]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখার্জি প্রভৃতি বাঙ্গালী সাংবাদিকরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ইংরেজের শাসনব্যবস্থার সংস্কার করতে চেয়েছেন। এঁরা অকপটভাবেই বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং গণতন্ত্রে ইংরেজের নিষ্ঠা ও প্রীতি কালক্রমে ভারতবর্ষে প্রগতিশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা করবে। কিন্তু গণতন্ত্রে এঁদের অগাধ আস্থা এঁদের নীরব থাকতে দেয়নি। তৎকালীন ইংরেজ-শাসনের তীব্র সমালোচনা করতে, ভারতীয় মহা-বিদ্রোহের সময় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ও ফৌজের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এঁরা কুণ্ঠিত হননি। ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে হরিশ্চন্দ্র মুখার্জির দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত খয়ের খাঁ দলভুক্ত শিক্ষিত বাঙালীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামতের সঙ্গে মেলেনি।

হরিশ্চন্দ্র লিখেছেন : আমরা মনে করি যে, সমসাময়িক লোকেরা ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ঘটনাকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন ইতিহাস তদপেক্ষা একেবারে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে সেই ঘটনাকে দেখবে। (হরিশ্চন্দ্র মুখার্জির রচনাবলী [ইং] দি হিন্দু পেট্রিয়ট, ৬ই মে ১৮৫৮)

ইংরেজ শাসন সম্পর্কে যাঁদের মোহমুক্তি ঘটছিল হরিশ্চন্দ্র তাঁদেরই মুখর প্রতিনিধি। কৃষ্ণদাস পাল, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণের নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু এঁরা ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সময় ইংরেজ শাসকদের প্রতি দেশের লোকের আনুগত্য প্রমাণের যে অশোভনীয় আগ্রহ দেখিয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্র কখনও তা' দেখান নি। হরিশ্চন্দ্রের সাংবাদিকতা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগ স্থাপন করে এক নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখের সাংবাদিকতা কালক্রমে মডারেট বা নরমপন্থী রাজনৈতিক চিন্তাধারাকেই পুষ্ট করেছিল, যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগ কখনও স্থাপিত হয়নি।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত লোকই ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সময় নির্ভীকভাবে বলতে পেরেছিলেন :

"ভারতবাসীদের মধ্যে এমন একজন লোকও নেই যে ভারতে বৃটিশ শাসনজনিত অভিযোগের নিষ্পেষণ পরিপূর্ণভাবে অনুভব করে না—আর অভিযোগগুলি হল বৈদেশিক শাসনের নিকট অধীনতা স্বীকার থেকে অবিচ্ছেদ্য।"

(হিন্দু পেট্রিয়ট, ২১মে ১৮৫৭)

["There is not a single native of India who does not feel the full weight of the grievances imposed upon him by the very existence of the British rule in India—grievances inseparable from subjection to a foregin rule."]

(Hindu Patriot, 21 May, 1857, Quoted in "Civil Rebellion in the Indian Mutinies, 1857-59" by Dr. S. B. Choudhury. P 259)

"নরমপন্থী ব্যক্তির চরমপন্থী উক্তির তাৎপর্য যতখানি, চরমপন্থী ব্যক্তির চরমপন্থী উক্তির মূল্য তুলনায় অনেক কম" এবং "[illegible] কথা নয়, সংবাদপত্রের প্রচারপত্র" ইত্যাদি কূট নৈয়ায়িক যুক্তি দেখিয়ে হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও কালিদাস মুখোপাধ্যায় হরিশ্চন্দ্রের

ঐতিহাসিক মন্তব্যের গুরুত্ব লাঘবের প্রাণপণ ও হাস্যকর প্রচেষ্টা করেছেন।

(১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ বা ডাঃ মজুমদার, ডাঃ সেন ও বিরুদ্ধপন্থীদের আলোচনার পর্যালোচনা পৃঃ ১২)

'নেটিভ ফাইডেলিটির' [১] লেখক (সম্ভবতঃ কৃষ্ণদাস পাল। এবিষয়ে হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের যুক্তিই আমি গ্রহণ-যোগ্য মনে করি—লেঃ) এবং ইংরেজের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত কিশোরী চাঁদ মিত্রের "The Mutinies, the Government and the People" (1858) গ্রন্থের সব কথাকে বেদবাক্য বলে গ্রহণ করার কোন কারণ নেই। শতাধিক বছর আগে বিশাল ভারতবর্ষে কে কোথায় কয়েকজন ইংরেজকে আশ্রয় দিয়েছিল তার দৃষ্টান্ত যেমন সমস্ত ভারত-বাসীর আনুগত্যের নিদর্শন বলে গ্রাহ্য হতে পারে না, তেমনি "বিদ্রো-হের দলপুষ্ট করেছিল কারামুক্ত বদমায়েশ কয়ে জনসাধারণ নয়" এমন ধরনের কথা ইংরেজের মিথ্যা প্রচার এবং মহাবিদ্রোহের সম্পর্কে চরম অজ্ঞতারই ফল

প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের যে অংশ বিদেশী শাসন সম্পর্কে ক্রমে মোহমুক্ত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্র তাঁদেরই মনের কথাকে ভাষা দিয়েছিলেন, অতিরঞ্জন যদি থাকেও তা'হলেও তা' সত্যেরই অতিরঞ্জন। হরিশ্চন্দ্র যে সত্য কথাই বলেছিলেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল ডাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফের মন্তব্য। ডাঃ ডাফ ইংরেজ, শিক্ষিত বাঙ্গালীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাঁর কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ডাঃ ডাফ মহাবিদ্রোহের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন: "আমাদের বাঙ্গালী জনসাধারণের বহু লোক এখনও সমগ্র ব্যাপারটাকেই কেমন যেন যুক্তিহীন ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখছে। তারা অনুগত অথবা অনুগত নয় এমন কোন কথাই বলা চলে না। অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষের

১। পুরো নাম—The Mutinies and the Government and the people or statements of native fidelity.

হৃদয়ের গভীরে অসন্তোষ বর্তমান। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বহু লোক আবার আমাদের শাসনকে বেশ ভাল নজরেই দেখে; যদিও, অনুরাগের কথা বলাটা ভুল ধারণার সৃষ্টিতেই সাহায্য করবে।"

(The Indian Rebellion, its causes and
Results P. 180—ডা: সুরেন্দ্র নাথ সেনের
'এইট্টিন ফিফটি সেভেন'-এ উদ্ধৃত পৃ: ৪১১)

প্রকৃত পক্ষে, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের রচনাবলী প্রমাণ করে যে, বাঙ্গালী মধ্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্রোহ সম্পর্কে নানামত পোষণ করতেন। আজকের মত সেদিনও 'নানা মুনির নানা মত' ছিল।

[৩]

এখন বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের যে অংশ প্রধানতঃ ইংরেজ সরকারের চাকুরিয়া ছিলেন, বিশেষ করে যাঁরা বাংলার বাইরে কাজ করতেন তাঁদের কথা বলব। এঁরা ইংরেজের সহকারী হয়ে বৈষয়িক দিক থেকে খুবই লাভবান হয়েছিলেন, কাজেই এঁদের একটি বড় অংশ একেবারেই 'খয়ের খাঁ' শ্রেণীতে পরিণত হন। শ্রীবিনয় ঘোষ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 'আনুগত্য' যে 'ক্রীতদাস সুলভ আনুগত্য' ছিল না তা' প্রমাণ করার জন্য কূট নৈয়ায়িক যুক্তির অবতারণা করেছেন (Rebellion 1857—A Symposium-পৃ: ১০৩)। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্তর বিচার করলে তাঁর ঐ ধরণের ঢালাও যুক্তি উপস্থিত করার কোন দরকার হত না এবং সমগ্র শ্রেণীকে একই স্তরভুক্ত করে তথ্যবিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হবারও প্রয়োজন হত না।

প্রকৃত পক্ষে, বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের একাংশ 'ক্রীতদাস সুলভ আনুগত্য' দেখিয়েছিলেন। দুর্গামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদেরই প্রতিনিধি। বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের এই অংশই মহাবিদ্রোহের সময় সর্বপ্রকারে ইংরেজদের সাহায্য করে, ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়। এই শ্রেণীর বাঙ্গালীদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়ে ইংরেজ শাসকরা একদিকে একদল 'খয়ের খাঁ' তৈয়ার করে এবং অপর দিকে এই 'খয়ের খাঁ'দের দাপট ও প্রভুত্ব দেখানোর সুযোগ দিয়ে প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করে, যার বিষক্রিয়া আজও চলেছে।

এই প্রসঙ্গে স্তালিনের একটি মন্তব্য স্মরণ রাখার মত।

১৯২৩ সনের ২৩শে এপ্রিল স্তালিন রুশ কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে জাতীয় উপাদান সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাঠ করেন তাতে বলা হয়ঃ "শাসন করার একটা পুরানো, সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতি অনুসারে একটা ধনিক সরকার কয়েকটি জাতিকে নিজেদের প্রিয়পাত্র করে তোলে, তাদের সুবিধাদি দেয় এবং অন্য জাতিগুলি নিয়ে মাথা ঘামাতে না চেয়ে তাদের দমিয়ে রাখে।

"এই পন্থায় গ্রেট বৃটেন এখন ভারত শাসন করছে। আমলাতন্ত্রের দিক থেকে ভারতের জাতি ও উপজাতিগুলি নিয়ে কারবার সহজতর করার জন্য গ্রেটবৃটেন ভারতবর্ষকে বৃটিশ ভারত (লোকসংখ্যা ২৪কোটি) ও দেশীয় ভারত (লোকসংখ্যা ৭ কোটি ২০ লক্ষ) এই দুই ভাগে ভাগ করেছে। কেন ? কারণ গ্রেটবৃটেন বাকি জাতিগুলিকে সহজে শাসন করার জন্য জাতিগুলির একটা জোটকে বেছে নিতে এবং তাদের সুবিধাদি দিতে চায়।

"...কারণ, প্রথমতঃ, অন্যান্য জাতির অসন্তোষ যাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেই সৃষ্টি হবে, গ্রেটবৃটেনের

বিরুদ্ধে নয় এবং দ্বিতীয়তঃ, আট শত জাতি অপেক্ষা দুটো কি তিনটে জাতি নিয়ে 'মাথা ঘামানো' সহজ।"

(মার্কস-ইজম এণ্ড দি ন্যাশানাল এণ্ড কলোনিয়াল
কোয়েশ্চন—পৃঃ ১৪২-৪৩)

এই 'সহজতর' ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে শেষ পর্যন্ত যে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটবে এ কথাও স্তালিন বলেছেন।

ভারতে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী প্রভৃতির প্রতি ইংরেজ শাসকদের কৃপাদৃষ্টি যে একান্তই অকারণে বর্ষিত হয় নি তা' বুঝতে বিলম্ব হয় না, কিন্তু এর ফলে ইংরেজ যে তার নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছিল সে ত আমরা প্রত্যক্ষই করেছি।

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সময় বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের একাংশ পুরোপুরি 'খয়ের খাঁ' বনে যেয়ে ইংরেজের নীতির প্রারম্ভিক সাফল্য প্রমাণ করেছিল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সময় এই শ্রেণীর বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের আচরণ এবং তার ফলে কিভাবে অযোধ্যা ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বাঙ্গালীবিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, তার বিবরণ তাঁর 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস (১ম খণ্ড)'-এ নিরপেক্ষ ভাবেই দিয়েছেন।

মিউটিনির আমলে জেনারেল হ্যাভেলক কানপুর পুনরধিকার করার পর এই খয়ের খাঁ বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের মুখপাত্ররাই লিখেছিলেন ঃ

"It is well known, your excellency's lordship that we, the Bengalees, are a cowardly people"

(History of Indian Mutiny,
Vol I, by Charles Ball, p. 612)

অর্থাৎ হুজুর, একথা সুবিদিত যে, আমরা বাঙ্গালীরা ভীরু জাতি। কানপুরপ্রবাসী এই বাঙ্গালীদের কাহিনী অবলম্বনে ১৩৬১ সালের শারদীয় 'যুগান্তরে' প্রকাশিত শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর 'ছিন্ন দলিল' গল্পটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সাক্ষ্যও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গাদাস 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর অনুরোধে নিজের জীবন-কাহিনী বলে যান এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র এই

জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। 'জন্মভূমি' [১] পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে দুর্গামোহনের 'আমার জীবন চরিত' প্রকাশিত হয়। মুখবন্ধে (জন্মভূমি, আষাঢ়, ৭ম সংখ্যা, ১২৯৮) দুর্গামোহন অপকটভাবেই বলেন, "ইংরেজের লুন খাইয়া আমি কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়াছি।" বাঙ্গালীদের সম্পর্কে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জনসাধারণের কি ধারণা হয়েছিল দুর্গামোহন তা' পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন ঃ

"উত্তর-পশ্চিম দেশবাসীগণের তখন সাধারণতঃ ধারণা ছিল,—ইংরেজ ও বাঙ্গালী এক দেহ, এক প্রাণ। বাঙ্গালী ইংরেজের গুপ্তচর, গুপ্তমন্ত্রী। বাঙ্গালী ইংরেজের দক্ষিণহস্ত—সিন্দুকের চাবি, অঙ্গুরীর হীরা, ব্যঞ্জনের লবন। স্বভাবতই বাঙ্গালী ইংরেজের পক্ষ। অতএব মার, ধর, বাঁধ বাঙ্গালীকে।"

(আমার জীবন-চরিত, ২য় ভাগ, দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ,
জন্মভূমি ১২৯৮-১২৯৯, পৃঃ ১৬৮)

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সময় বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মনোভাব পর্যালোচনা করার পর এখন আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের প্রতি। কড়চা বা রোজনামচা, আত্মচরিত, উপাখ্যান, নাটক প্রভৃতি সবকিছুই এই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

১। 'জন্মভূমি'—মাসিক পত্রিকা, ১২৯৭ সালের পৌষমাস প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

সমসাময়িক সাহিত্যের সাক্ষ্য

(১) যদুনাথ সর্বাধিকারীর 'তীর্থভ্রমণ'

কলকাতার স্থপরিচিত সর্বাধিকারী পরিবারের পূর্বপুরুষ যতুনাথ সর্বাধিকারী জন্মগ্রহণ করেন ১২১২ সালে (১৮০৪ খৃস্টাব্দে) রাধানগরে, রাজা রামমোহনের জন্মের প্রায় ত্রিশ বছর পরে।

স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ায় যতুনাথ ১২৬০ সালের ১১ই ফাল্গুন তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ১২৬৪ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় চার বছর তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থে পর্যটন করেন। এই তীর্থ ভ্রমণের কাহিনী রোজনামচার আকারে যতুনাথ লিপিবদ্ধ করে যান। সেকালে বাংলা সাহিত্যে সরল, সহজ বাংলায় লেখা এই কড়চা বা রোজনামচা জাতীয় রচনা সত্যই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

যতুনাথের তীর্থ ভ্রমণের রোজনামচা দীর্ঘকাল পরে ১৩২২ সালে প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। যতুনাথের তীর্থ ভ্রমণকালে ভারতীয় মহাবিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। এই মহাবিদ্রোহের কিছু বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যতুনাথ সরল প্রকৃতির মানুষ, যা দেখেছেন এবং যা শুনেছেন তাই তিনি রোজনামচায় লিখেছেন, মন্তব্য করেছেন কদাচিৎ। শান্তি-প্রিয় সাদাসিদে লোক, রাজনীতির ঘোর প্যাঁচ বুঝতেন না, বোধহয় বুঝতে চাইতেনও না এবং সম্ভবতঃ কখনও কল্পনাও করেন নি যে তাঁর রোজনামচা রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ প্রকাশিত হবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাই হল। নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত এই রোজ-নামচাটি লর্ড কারমাইকেলকে উৎসর্গ করেন (উৎসর্গপত্র ইংরাজী ভাষায় লেখা) এবং ভূমিকায় বলেন যে যতুনাথ "বরাবর মুক্তকণ্ঠে

বলিয়া আসিয়াছেন দুর্বৃত্তেরা অত্যাচার করিয়া দেশেরই শত্রুতা করিয়াছে, ইংরাজেরা কিছুই করিতে পারিবে না।" (মুখবন্ধ)

অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে, যদুনাথের মুখে যে কথা বসানো হয়েছে তাঁর লেখা দীর্ঘ রোজনামচার কোথাও সেকথা নেই।

রোজনামচার নাম দিয়েছেন নগেন্দ্রনাথ এবং জায়গায় জায়গায় কিছু কিছু বাদ-ছাড়ও আছে। মূল রোজনামচাতেই ঐ ধরনের বাদ-ছাড় ছিল, না, সম্পাদক নিজে কাঁচি চালিয়েছেন তা' জানবার উপায় নেই।

এখন যদুনাথের কথা তাঁর রোজনামচা থেকেই শোনা যাক।

১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ১১ই মে (সন ১২৬৪, ৩০শে বৈশাখ) সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। (পৃঃ ৪৬০) বিদ্রোহের কিছু কিছু বিবরণ দেবার পর লেখা হয়েছে "এত শাসনেও (বিদ্রোহ) নিবৃত্ত হয় না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।" (পৃঃ ৪৭৫)

যে সব জমিদার ইংরাজদের সাহায্য করেছিলেন তাঁদের যদুনাথ 'খঁয়ের খাঁ' বলতে দ্বিধা করেননি। এই সব জমিদার সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে, তাঁহারা "সরকারের খয়ের খাঁ" হইয়া সুখ্যাতি পত্র পাইলেন (পৃঃ ৪৭৪)।

উত্তর প্রদেশে কাশী অঞ্চলের ক্ষত্রিয় বিদ্রোহীদের বীরত্ব যে যদুনাথকে মুগ্ধ করেছিল তা' তাঁর বর্ণনার ভঙ্গীতেই বোঝা যায়। কাশীর রাজা মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করলে বিদ্রোহী গুমান সিং জবাব দিচ্ছেন :

"যখন মানহানি হইয়াছে, তখন ধন প্রাণের ভয় কি আছে? সাহেবদিগের সহিত মিল করিতে হইলে ঘরের বহু-বেটি না দিলে হইতে পারে না। আমরা একবার ভাল করিয়া চাক্ষুষ করিব। যাহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রাণদণ্ড করিবে, তাহাতেও দুঃখিত নহি। যেহেতু তাহারা ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম তাহা করিয়াছে, রণে ভঙ্গ দেয় নাই, সম্মুখ সংগ্রামে ধৃত হইয়াছে। আর আমাদের ধন-সম্পত্তি সকল লুঠ করিয়াছে। আর কি আছে। এক্ষণে জীবৎমান

থাকাতে কেবল ক্লেশ ভিন্ন নহে, স্বল্প দোষে লইয়া যাইয়া প্রাণদণ্ড করিবে, তাহাতে ইহলোক পরলোকে দোষ আছে। তদপেক্ষা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ হইলে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মমতে মোক্ষপদ পাইব—চিরজীবী কেহ নহে।" (পৃঃ ৪৯৮-৪৯৯)

সাহেব এবং বাঙ্গালীদের উপর বিদ্রোহীদের যে আক্রোশ ছিল একথা যদুনাথও বলেছেন,……"সাহেব ও বাঙ্গালীদিগকে দেখিতে পাইলেই অধিক আক্রমণ।" (পৃঃ ৫০৩)

বিদ্রোহীদের সুশাসনের দৃষ্টান্তও যদুনাথ দেখিয়েছেন ঃ

"সিপাহীগণ নানা সাহেবকে রাজা করিয়া কানপুরের নিকটবর্ত্তী সকল দেশে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজ্য মধ্যে এমত শাসন করিল যে, পথিক ব্যক্তির কি প্রজাবর্গের যে কেহ দ্রব্যাদি হরণ কি দৈহিক দুঃখদায়ক হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহার শিরচ্ছেদ হইবে, স্বল্পদোষী হইলে হস্ত-পদ ছেদন করা হইবে। এই মত শাসন করিয়া পথিকগণের পথ কষ্ট দূর করিয়াছিল।" (পৃঃ ৫০৫)

বাংলাদেশে ইংরেজদের আতঙ্ক এবং সতর্কতা অবলম্বনের বিবরণ যদুনাথের লেখায় পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ঃ

"গঙ্গাতীরে কামান পাতা ছিল, সিপাহীদিগের গোলযোগে রাজ্যে গোলযোগ হওয়াতে ঐ সকল কামান এবং বন্দুক পিস্তল তরোয়াল ইত্যাদি যে কিছু যুদ্ধের অস্ত্রাদি যাহার বাটীতে ছিল, তাহা সমস্ত সরকার বাহাদুর উঠাইয়া লইয়া আপন অস্ত্রালয়ে রাখিয়াছেন, কাহার বাটীতে কিছু অস্ত্র মাত্র নাই।" (পৃঃ ৫৫৬)

বহরমপুরের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"ছাউনিতে আট শত গোরা আছে। দেশী পদাতিক যাহারা পূর্ব্বাবধি এই ছাউনিতে পল্টন ছিল, তাহাদের যুদ্ধ-বিক্রমের বন্দুক তরবারি ইত্যাদি যাহা ছিল, সকল লইয়া নিরস্ত্র করিয়া এক এক সরু ছড়ির ন্যায় লাঠি দিয়াছে। লাঠি হস্তে প্রহরীর কর্ম্ম করে। ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত।" (পৃঃ ৫৫৮)

(২) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মচরিত'

"ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন এবং 'সাংসারিক সকল ব্যাপারে উদাসীন' দেবেন্দ্রনাথ যখন হিমালয় ভ্রমণে বেরোলেন তখন মহাবিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠার সূচনা দেখা দিয়েছে। যে বছর তিনি সিমলায় পৌঁছলেন সেই বছরেই বিদ্রোহ শুরু হয়। সিমলায় হঠাৎ খবর আসে যে, গুর্খারা সিমলা লুঠ করতে আসছে। তখন যে যেখানে পারে পালাতে থাকে, দেখতে দেখতে সিমলা জনশূন্য হয়ে যায়। দেবেন্দ্রনাথকেও বাধ্য হয়ে সিমলা ত্যাগ করতে হয়। ব্রহ্মচিন্তায় যতই মগ্ন থাকুন এ সময় দেবেন্দ্রনাথের উপস্থিত বুদ্ধি, আত্মনির্ভরতা, বৈষয়িক জ্ঞান, কোনটিরই অভাব হয়নি। ভয় যে তিনি পাননি তা' নয়, কিন্তু আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়েননি, সিপাহীদের সম্পর্কে কোন কটুক্তি করেননি বরং তাঁর নিজের লেখায় (অজিত চক্রবর্তীর রচিত গ্রন্থে আধ্যাত্মিকতার উপর বড় বেশী জোর দেওয়া হয়েছে, ফলে মানুষ দেবেন্দ্রনাথ ঢাকা পড়ে গেছেন।) পরিহাস রসিক, শান্তচিত্ত একটি মানুষের যে চেহারাটি আমাদের চোখে পড়ে তা' সত্যই আমাদের মন কেড়ে নেয়। ভীরু বাঙ্গালী সঙ্গীর 'চাচা আপন বাঁচা' নীতি, ভৃত্য কিশোরীর অতিবুদ্ধির কাহিনী, গোরা সৈন্যদের আতঙ্কবিহ্বল চেহারা উপভোগ্য ছবির মত দেবেন্দ্রনাথের লেখায় ফুটে উঠেছে।

গুর্খা বিদ্রোহীদের আক্রমণের ভয়ে ভীত সঙ্গী প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট যেয়ে দেবেন্দ্রনাথ দেখলেন : "তিনি দেওয়ালের চুণ লইয়া কপালে দীর্ঘ ফোটা করিয়াছেন। গলা হইতে উপবীত বাহির করিয়া চাপকানের উপর পরিয়াছেন। চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ মলিন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "গুরখারা বামুন মানে।" জিজ্ঞাসা করিলাম, হয়েছে কি ? তিনি বলিলেন যে, "গুরখা সৈন্যরা সিমলা লুঠ করিবার জন্য আসিতেছে। আমি স্থির করিয়াছি যে, আমি খদে

যাইব। আমি বলিলাম যে, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। এই কথায় তাঁহার মুখ আরও শুকাইল।"

(প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্তৃক লিখিত শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন-চরিত (১৮৯৮)। পৃ: ১৫৯-১৬০)

সিমলা থেকে ডগসাহী পৌঁছে দেবেন্দ্রনাথ পরদিন সকালে পাহাড়ের চুড়ায় উঠে দেখলেন ঃ

"...সেই চুড়াতে মদের খালি বাক্স বসাইয়া গোরা সৈন্যরা এক চক্রাকৃতি কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহার মধ্যে একটা পতাকা উড়িতেছে, তাহার নীচে একটা গোরা খোলা তরয়াল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি আস্তে আস্তে সেই বাক্সের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সেই কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং অতি ভয়ে ভয়ে সেই গোরার কাছে গেলাম। মনে করিলাম এ বা আমার উপর তাহার তলওয়ার চালায়। কিন্তু সে অতি মলিন ও বিষণ্ণভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গুর্গারা কি এখানে আসিতেছে?" আমি বলিলাম, "না, এখন এখানে আসে নাই।"

(স্বরচিত জীবন চরিত, পৃ: ১৬৬)

(৩) *রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত*

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০৯) ১৮৫১ খৃস্টাব্দে মেদিনীপুর গভর্ণমেণ্ট জেলা-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি এই পদে নিযুক্ত থাকাকালেই ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সুরু হয়। বিধবা বিবাহ সমর্থন করেছিলেন বলে রক্ষণশীল সিপাহীরা তাঁকে নির্যাতন করতে পারে এ ভয় রাজনারায়ণ বসুর ছিল, কিন্তু এই ভয় অপেক্ষা দেশপ্রেমিক এই মানুষটি সাহেবদের এবং 'খয়ের খাঁ' বাঙ্গালীদের নিদারুণ আতঙ্কের যে ছবিটি তাঁর আত্মচরিতে এঁকেছেন সেটিই সর্বাধিক উপভোগ্য।

রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন ঃ

"১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। সিপাহীবিদ্রোহের ভারত-ব্যাপী তরঙ্গ মেদিনীপুর পর্য্যন্ত পৌঁছে। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে বিদ্রোহী সিপাহীরা মিরাট নগর ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করে। সিপাহীদিগের গুপ্ত ষড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল যে ১০ই মে'র অব্যবহিত পরেই একজন তেওয়ারি ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরস্থ রাজপুতজাতীয় সিপাহীর পল্টনকে বিগড়াইবার চেষ্টা করে। তখন ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহের শৈশবাবস্থা। মেদিনীপুরে যে রাজপুতজাতীয় সিপাহীর পল্টন ছিল তাহার নাম Shekawatee Battalion ছিল। কর্ণেল ফষ্টার (Colonel Foster) এই পল্টনের অধিনায়ক ছিলেন। উক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণকে মেদিনীপুর স্কুলের সম্মুখে কেল্লার মাঠে ইংরাজেরা ফাঁসী দেন। এক স্থানের বিদ্রোহের সংবাদের পর আর এক স্থানের বিদ্রোহের সংবাদ যেমন মেদিনীপুরে আসিতে লাগিল তেমনি মেদিনীপুরবাসী অত্যন্ত ভয়াকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। তখনকার যে সকল কাগজে বিশেষতঃ Phoenix কাগজে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত তাহা আমরা কি পর্য্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত পাঠ করিতাম তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালীদের অপেক্ষা সাহেবরা আরও অধিক ভীত হইয়াছিলেন। হইবারই কথা। একদিন সাহেবেরা ক্যাণ্টনমেণ্টে গিয়া সিপাহীদিগকে ডাকিয়া একটা থালের উপর ধানদূর্ব্বা রাখিয়া প্রত্যেক সিপাহীকে তাহা ছুঁইয়া এই শপথ করিতে বলিলেন যে সে বিদ্রোহী হইবে না। প্রত্যেক সিপাহী সেইরূপ শপথ করিল। কিন্তু সাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস হইল না। জুন মাস পড়িতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মেদিনীপুরের নিকট কংসাবতী নদী গ্রীষ্মকালে শুষ্ক থাকে, বৃষ্টি পড়িলে প্রবাহমান হয়। সাহেবরা ও কোন কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোক কংসাবতী নদীতে নৌকা প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। এই মানসে রাখিয়া-ছিলেন যে যখনই বিদ্রোহ হইবে তখনই নৌকায় চড়িয়া পলায়ন করিবেন। একদিন সন্ধ্যার সময় কালেক্টর সাহেব খানা খাইতে বসিয়াছেন এমন সময়ে মেদিনীপুরের জমিদারী কাছারীর কোন ভৃত্য সখ

করিয়া একটি বোমা ছুড়িল। বোমার আওয়াজ শুনিবামাত্র সাহেবের হাত হইতে ছুরি কাঁটা পড়িয়া গেল এবং আওয়াজের কারণ জানিবার জন্য চাপরাসীর পর চাপরাসী পাঠাইলেন। আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যাণ্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া কাজ করিতাম, যখনই সিপাহী আসিবে প্যাণ্টালুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়াছিলাম। সিপাহীদিগের প্যাণ্টালুনের উপর বিশেষ রাগ ছিল।"

(রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত পৃঃ ১০১-১০৩।
১৩১৫ সাল বা ১৯০৯ খৃস্টাব্দের সংস্করণ।)

(৫) *শিবনাথ শাস্ত্রীর বিবরণ*

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন ঃ

"১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতাতে এরূপ জনরব উঠিল যে, বিদ্রোহী সিপাহীগণ আসিতেছে, তাহারা কলিকাতা সহরের সমুদয় ইংরাজকে হত্যা করিবে এবং কলিকাতা সহর লুট করিবে। এই জনরবে কলিকাতার অনেক ইংরাজ কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইলেন; দেশীয় বিভাগেও লোকে কি হয় কি হয় বলিয়া ভয়ে ভয়ে দিনযাপন করিতে লাগিল। ইংরাজ ফিরিঙ্গি ও দেশীয় খ্রীষ্টানগণ সর্ব্বদা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন্দুকের দোকানের পসার অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গেল। ইংরাজগণ ভয়ে ভীত হইয়া গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে অনেক অদ্ভুত পরামর্শ দিতে লাগিলেন,—কালাদের অস্ত্রশস্ত্র হরণ কর, কঠিন সামরিক আইন জারি কর, ইত্যাদি; ক্যানিং তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। এজন্য ইংরাজেরা তাঁহার নাম Clemency Canning 'দয়াময়ী ক্যানিং' রাখিলেন। আজ শোনা গেল দেশীয় সংবাদপত্র সকলের স্বাধীনতা হরণ করা হইবে; কালি কথা উঠিল, রাত্রি ৮টার পর যে মাঠের ধারে যায় তাহাকেই গুলী করে, সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত; একটি জিনিসের প্রয়োজন

হইলে পাওয়া যাইত না; লোকে নিজ বাসাতে দুই চারিজনে বসিয়া অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না, মনে হইত প্রাচীরগুলি বুঝি শুনিতেছে। কিছু অধিক রাত্রে গড়ের মাঠের সন্নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া আসিতে গেলেই পদে পদে অস্ত্রধারী প্রহরী জিজ্ঞাসা করিত, 'হুকুমদার' অর্থাৎ (Who comes there ?) তাহা হইলেই বলিতে হইত, 'রাইয়ত হ্যায়' অর্থাৎ আমি প্রজা, নতুবা ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়িত। এইরূপে সকল শ্রেণীর মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্ক জন্মিয়া কিছুদিন আমাদিগকে স্থির থাকিতে দেয় নাই।"

(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পৃঃ ১০৫-৬,
১৯০৯ সনের ২য় সংস্করণের নিউ এজ সংস্করণ)

(৬) *কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'*

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ যখন ঘটে তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) বয়স ছিল ষোল-সতর বছর। অল্পবয়সেই কালীপ্রসন্নের সাহিত্যিক প্রতিভা অঙ্কুরিত হয়। ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে ১৮ বছর বয়সে কালীপ্রসন্ন 'মালতী-মাধব' নাটক রচনা করেন। এই নাটকের একটি গানে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি যথারীতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

গানটি নিম্নরূপ ঃ

"ভারতের কর্ত্রী যিনি ভিক্টোরিয়া মহারাণী ;
চিরজীবী হোন তিনি, প্রিয় পুত্র স্বামী সনে
দুরাত্মা বিদ্রোহী দল, যাক সবে রসাতল,
রাজকরে হোক বল, দুর্জ্জয় হউক রণে।"

(মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—মন্মথনাথ ঘোষ, পৃঃ ২৬-২৭)

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা অনিবার্য এ রকম একটা ধারণা কালী-প্রসন্ন সিংহের হয়ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় (১৮৬২) বিদ্রোহকালে ভেতো বাঙ্গালী, ফিরিঙ্গি এবং

ইংরাজদের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষ ও বঙ্গেই বড় হয়ে উঠেছে। কলকাতায় বিদ্রোহের খবর পৌঁছুলে—"সহরে ক্রমে হুলস্থুল পড়ে গেল, চুণোগলি ও কসাইটোলার মেটে ইদ্‌রুস পিদ্‌রুস, গমিস ডিস্ প্রভৃতি ফিরিঙ্গিরে খাবার লোভে ভলিন্‌টিয়ার হলেন,……'শ্রীবৃদ্ধিকারী' সাহেবেরা (হিন্দুর দেবতা পঞ্চানন্দের মত) বড় ছেলের কিছু কর্ত্তে পাল্লেন না, ছোট ছেলের ঘাড় ভাঙ্গার উজ্জুগ পেলেন—সেপাইদের রাগ বাঙ্গালীর উপর ঝাড়তে লাগলেন ! লর্ড ক্যানিংকে বাঙ্গালীদের অস্ত্রশস্ত্র (বঁটি ও কাটারি যন্ত্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ কল্লেন ! বাঙ্গালীরা বড় বড় রাজকর্ম্ম না পায়, তারও তদ্বির হতে লাগলো ;……বাঙ্গালীরা ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে সভা করে, সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে,—যদিও একশ বছর হয়ে গেল, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালীই আছেন—বহুদিন বৃটিশ সহবাসে, ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্যবহারেও আমেরিকানদের মত হতে পারেননি। (পারবেন কি না তারও বড় সন্দেহ) !

"ইংরাজেরা মাগ, ছেলে ও স্বজাতির শোকে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুতরাং তাতেও ঠাণ্ডা হলেন না—লর্ড ক্যানিংয়ের রিকলের জন্যে পার্লিয়ামেণ্টে দরখাস্ত কল্লেন, সহরে হুজুকের একশেষ হয়ে গেল। বিলেত থেকে জাহাজ জাহাজ গোরা আসতে লাগলো—সেই সময়ে বাজারে এই গান উঠলো—

গান

"বিলেত থেকে এলো গোরা,
মাথার পর কুরাত পরা,
পদভরে কাঁপে ধরা, হাইল্যাণ্ড নিবাসী তারা।
টামটিয়া টোপীর মান
হবে এবে খর্ব্বমান,

সুখে দিল্লী দখল হবে,
নানা সাহেব পড়বে ধরা ॥

[হুতোম প্যাঁচার নক্সা—বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৫৫-৫৭]

বাঙালীদের বিরুদ্ধে শ্লেষ চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে 'মিউটীনি' বলে যে রচনাটির উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল তার শেষ দিকের কয়েকটি লাইনে।

"রোগ শোক ও বিপদে যেমন লোকে পতিগত স্ত্রীর মূল্য জানতে পারে, সেইরূপ মিউটীনির উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টও বাঙ্গালী শব্দের কথঞ্চিৎ পদার্থ জানতে অবসর পেলেন ;… ….".

মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় প্রথম বাংলা উপন্যাস

(১) চিত্তবিনোদিনী

১৮৫৭ সালে ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ১৭ বৎসর পরে বিদ্রোহের পটভূমিকায় প্রথম বাংলা উপন্যাস প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির নাম হল 'চিত্তবিনোদিনী' অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৭৯৬ শকে অর্থাৎ ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ এম. এ. বি. এল প্রণীত এই উপন্যাসটি হরিনাভির প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছিল মাত্র এক টাকা চার আনা। ৩০২ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই বৃহৎ উপন্যাসটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে লেখক কর্তৃক ঘোষিত হলেও উপন্যাসটি আসলে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত একখানি 'রীতিমত নভেল।'

সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর নিদর্শন হিসাবে এই বইটি বিশেষ মূল্যবান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে 'চিত্তবিনোদিনীর' একটি মাত্র কপি আছে, অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না। সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত কপিটিতে কয়েকটি পাতা নেই, অবশ্য তাতে সমগ্র গ্রন্থটির আখ্যান অনুধাবনে বিশেষ কোন বাধা হয় না।

'চিত্তবিনোদিনী' সুবৃহৎ উপন্যাস। মূল প্লট ছাড়াও উপন্যাসটিতে একটি সাব-প্লটও আছে। লেখা বেশ ঝরঝরে, বহু ঘটনা ও চরিত্রের ভিড় সত্ত্বেও কাহিনীর খেই হারিয়ে যায় না, যদিও পাঠক মাঝে মাঝে বিব্রত বোধ করেন ও হাঁফিয়ে ওঠেন। উপন্যাসটি ডিটেকটিভ উপন্যাসের

মত কৌতূহলোদ্দীপক, পড়তে বসলে শেষ না করে পারা যায় না, কিন্তু শেষদিকে একেবারে আজগুবির পর্যায়ে উঠেছে। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ একসঙ্গে তিন চারটি লোককে (যে-সে লোক নয়, নায়ক-নায়িকা) জলজ্যান্ত মেরে ফেলে এবং আরও তিন চারিটিকে মেরে ফেলার উদ্যোগ করে শেষ পর্যন্ত সবাইকে বাঁচিয়ে তুলে মধুর মিলনের মধ্যে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। লেখক এ বিষয়ে স্পষ্টবাদী। তিনি লিখেছেন : "যে দেশে মিলন না হইলে যাত্রা ভাঙ্গে না, যে দেশে কপালকুণ্ডলার পুনর্জীবন হয়, তথায় শোচনীয় ব্যাপারে গ্রন্থ শেষ অসাধ্য। আমাদের কাগজ না থাকে, গল্পে না কুলায়, ঘটনায় না চলে, মিলন দেখাইয়া দিতেই হইবে। উপরোধে নারদবাহন গলাধঃকরণ না করিলে কি স্ত্রী সমাজে সমাদর পাওয়া যায়।"

সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের যে দৃষ্টি-ভঙ্গী উপন্যাসটিতে প্রকাশ পেয়েছে তা মোটামুটি এই রকম :—

(১) সিপাহীরা বর্বর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কুসংস্কারে ও ধর্মান্ধতার ফলেই তারা বিদ্রোহ করে এবং "হিন্দুদিগের এই কুসংস্কারে, মুসলমানেরা পুনর্ব্বার রাজত্ব পাইবার আশা করিতে লাগিলেন।"

(২) বাঙ্গালী প্রগতিশীল ও ইংরাজ-ভক্ত। তাই "রাজধানীর নিকট, (তখন কলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল—লেঃ) সমুদ্রপথের নিকট, ইংরাজ-ভক্ত, বাঙ্গালীগণের দেশে বিদ্রোহীদের জয়াশা নাই।"

উপন্যাসের নায়ক চারুচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের মুখপাত্র। তিনি বলছেন : "কতিপয় সঙ্কীর্ণান্তঃকরণ ব্যক্তিগণের দোষে এই সামান্য অসুবিধা হয়, নচেৎ ইংলণ্ডের এরূপ ইচ্ছা কদাপি নহে। সময়ে এরূপ অভিযোগ আর করিতেও হইবে না। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে যে অমূল্য নিধি দিয়াছে, যথা—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সদ্বিচার, দস্যুতস্করের ভয় হইতে নিষ্কৃতি, নিরাপদ ভাব, বিদ্যালোক, ধর্ম-বিষয়ক স্বাধীনতা, কর্তব্যজ্ঞান, জীবন্ত ভাব, কুসংস্কার হইতে নিষ্কৃতি ইত্যাদি অসংখ্য

উপকার কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারে? এরূপ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন্ পাষণ্ড হস্তোত্তলন করিতে চাহে? ভারতবর্ষে এরূপ রাজ্য কখনও হয় নাই, হইবে কিনা সন্দেহ।"

বিদ্রোহীরা চারুচন্দ্রকে যখন দলে টানতে যায় তখন চারুচন্দ্র ঐ সকল যুক্তি দেখান। তবে কি চারুচন্দ্র ইংরাজ শাসনের কোন দোষ দেখতে পাননি? দোষ তিনি দেখেছিলেন কিন্তু সে দোষের জন্য তিনি সংকীর্ণমনা স্বল্পসংখ্যক ইংরাজ শাসককে দায়ী করেছেন। ইংরাজদের দোষ কি তা বর্ণনা করতে গিয়ে চারুচন্দ্র বলছেন—

"—মুসলমান বাদশাহরা যেরূপ রাজ্যসংক্রান্ত প্রধান প্রধান পদে নিরপেক্ষভাবে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিতেন, ইংরাজেরা তদ্রূপ নিরপেক্ষ নহে। স্বজাতি ব্যতীত অন্য কাহাকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিতে ইঁহারা নিতান্ত কুণ্ঠিত। তাহার কারণ মুসলমানেরা ভারতবর্ষকে স্বদেশ জ্ঞান করিত, এবং ইংরাজেরা অদ্যাপি যাহাতে ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশীয়দিগের যথেষ্ট লাভ হয় তাহাতেই স্বভাবতঃ ব্যস্ত।—"

বিদ্রোহের ফলে যে হানাহানি ও নৃশংসতা শুরু হয়েছে রোগগ্রস্ত অবস্থায় তা স্মরণ করে বিকারের মধ্যে চারুচন্দ্র প্রলাপ বকছেন: "মাতঃ ভারতভূমি। আর তোমার যন্ত্রণা দেখিতে পারি না। তোমার কুসন্তানরা বিদেশীয়ের প্রতি কিনা অত্যাচার করিতেছে—সেই বিদেশীয়েরা আবার প্রতিহিংসায় কি না করিবে।"

"...মাতঃ, আমরা কি তোমার স্বাধীনতা দানের উপযুক্ত? আমাদের বুদ্ধি, বল, উন্নতি, শুভ ইচ্ছা কৈ? হবে কিসে? যাহা ভাল ছিল হারাইয়াছি। এখন পূর্বাবস্থা পাইতে সহস্র বৎসরের শান্তি চাই।"

ইংরাজ শাসনে দেশবাসী যোগ্য হলে তবে স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা যাবে, এই হল চারুচন্দ্র তথা তৎকালের বেশীর ভাগ শিক্ষিত বাঙ্গালীর মূল বক্তব্য। লেখক তাঁর উপন্যাসের নায়কের মুখ দিয়ে

শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের চিন্তাধারা পরিষ্কারভাবেই উপস্থিত করেছেন।

(৩) হিন্দু ভাল এবং মুসলমান খারাপ—বিদ্রোহীদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের এই মনোভাবটুকুও প্রকাশ করেছেন। অবশ্য নানাসাহেবকে অত্যন্ত মসীবর্ণে চিত্রিত করা হয়েছে।

(৪) সিপাহীদের নৃশংস অত্যাচার বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইংরাজরা যা কিছু করেছে তা প্রতিহিংসাবশে এবং তার বর্ণনা মাত্র একটি প্যারায় (পৃঃ ২৪৩) সারা হয়েছে।

(৫) ইংরাজ শাসকদের দুই শ্রেণী—এক শ্রেণী "মহাত্মা কানিং বাহাদুরের" ন্যায় সহৃদয়, বিবেচক ও উদার, আর একশ্রেণী উগ্র মস্তিষ্ক, বলদর্পিত, যাঁরা "মনে করেন উর্বর ভারতবর্ষ আমেরিকার ন্যায় বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রচয়ে পরিণত হইলে এবং অবিশ্বাসী হিন্দুদিগকে সমূলোচ্ছেদিত অথবা কৃষি কার্যের সহায়মাত্র রূপে রক্ষা করিলে ইংলণ্ডের প্রভূত লাভের বিষয়। তাহা হইলে সিপাহীবল অনাবশ্যক হইবেক। সুতরাং কোন·কালে বিদ্রোহের ভয় করিতে হইবে না।"

লেখক উপন্যাসের পাদটীকায় বলেছেন যে বাংলায় নীলকরদের দৌরাত্ম্য "এই সম্প্রদায়ের মত কার্য্যে পোষণ করিয়াছে।" উগ্রমস্তিষ্ক ইংরাজদের চরিত্র উপন্যাসটিতে বিশেষভাবে আঁকা হয়েছে এবং তাদের নিয়ে যথেষ্ট ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়েছে।

উগ্র ইংরাজদের একটি গানের নিম্নরূপ বাংলা উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে :—

জয় ইংলণ্ডের জয়, ভারত রাজ্যের জয়।
ব্রিটিশ জয় পতাকা উড়িছে ভারতময়।
আমাদের বাহুবলে, আমাদের সুকৌশলে,
পড়িয়াছে পদতলে, পুরাণ ভারত।

এ অসভ্য মূর্খজাতি, লভি সভ্য জ্ঞান জ্যোতি,
বিপত্তয়ে অব্যাহতি, আছে সুখে রত।
তথাপি কৃতঘ্ন জাতি কিছুতে সন্তুষ্ট নয়!

পাপী শয়তানাশ্রিত, না বুঝি আপন হিত,
হয়ে বৃথা ভয়ে ভীত, ত্যজে সত্য ধর্ম।
দুর্মতি পাষণ্ডগণে, পূত কর ধর্মদানে।
নতুবা খেদাও বনে—নাহিক অধর্ম।
ধর্মহীন নরগণ বন্যপশু বৈ ত নয়!

ওহে ভারত কোম্পানী, দাও এই আজ্ঞা আনি।
তব ভারত এখনি, করি নিষ্কণ্টক।
আমেরিকা জয় মত, আদিম নিবাসী যত
বলে করি বনাশ্রিত—পুতুল পুঙ্গব।
ব্রিটিশ ভারত বাসে হিন্দু কভু যোগ্য নয়!

(৬) শিক্ষিত বাঙ্গালীর একদিন শ্বেতাঙ্গিনী বিয়ে করার ঝোঁক ছিল। ইঙ্গ-ভারতীয় তরুণী এমার সঙ্গে উপন্যাসের নায়ক চারুচন্দ্রের মিলন ঘটিয়ে লেখক সেই ঝোঁকটুকুও প্রকাশ করেছেন। "এমি আমাদের ঘরের বউ 'চিত্তবিনোদিনী'।"

দুই ভাগে (প্রথম ভাগে উপসংহার সহ ১৩টি এবং দ্বিতীয় ভাগে উপসংহার সহ ২৩টি অধ্যায়) বিভক্ত এই বৃহৎ উপন্যাসটির পটভূমিকা পুরোপুরি ঐতিহাসিক এবং নানাসাহেব, আজীমুল্লা প্রভৃতি কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রও এই উপন্যাসে স্থানলাভ করেছে। বাংলা দেশ ও প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস রচিত।

মূল কাহিনী নিম্নরূপ :—

কমিসারিয়েট বিভাগের কর্তা রেমণ্ড সাহেব খাস বিলাতী গোরা,

তবে তাঁর স্ত্রী একজন বড় জেনারেলের ভারতীয় পত্নীর (অথবা উপপত্নীর) কন্যা অর্থাৎ স্ত্রীটি ইঙ্গ-ভারতীয়। এর জন্যে রেমণ্ড সাহেব কিছুটা মনোকষ্টে আছেন, কারণ তাঁর পঞ্চাশ পুরুষের গৌরবগাথা নাকি তাঁর জানা আছে। রেমণ্ড সাহেবের কন্যা এমি—খাস বিলাতী সাহেবের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়াই তাঁর বাসনা। এমির এক সঙ্গিনী আছে, তার নাম হেলেনা। লালা বিজয় সিং নামক একজন হিন্দুস্থানী যুবক এমির প্রেমাকাঙ্ক্ষী। বিজয় কমিসারিয়েটে কাজ করে এবং সাহেবের প্রিয় পাত্র। কমিসারিয়েটের প্রধান কর্মচারী কাশীনাথ বসুর ভাইপো চারুচন্দ্র সুশিক্ষিত এবং কমিসারিয়েটে কাজ পেয়ে শীঘ্রই সাহেবদের নেকনজরে পড়েন। এমি চারুচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিজয় এর ফলে চারুচন্দ্রের উপর প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে ওঠে।

সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হলে চারুচন্দ্র বিশ্বস্তভাবে ইংরাজদের সহায়তা করে। কিন্তু একজন বিদ্রোহীর সঙ্গে ঘটনাচক্রে তার যোগাযোগ স্থাপিত হওয়াতে বিজয় তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এবং চারুকে বন্দী করায়। পরে চারু মুক্তি পায় এবং মীরাটের হত্যাকাণ্ডের পর সে যখন এমি ও হেলেনাকে উদ্ধার করার কথা ভাবছে তখন ইংরেজরা বিজয়ের চক্রান্তে আবার তাকে বন্দী করে এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে। নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে চারুচন্দ্র মুক্তিলাভ করে এবং এমি ও হেলেনাকে দুর্বৃত্তদের কবল থেকে উদ্ধার করে। বিজয় চক্রান্ত চালাতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত এক দস্যুদলের সাহায্য গ্রহণ করে। চারুচন্দ্র ও এমি দস্যুহস্তে বন্দী হয়। ঘটনাচক্রে প্রকাশ পায় যে, দস্যুদলপতি রঘুবর আসলে একজন বাঙ্গালী; বারাসত জেলার অন্তঃপাতী ইছাপুরের জমিদারের পুত্র প্রতাপচন্দ্র বসু এবং চারুচন্দ্র তাঁরই পুত্র। এমিকে বিজয়ের হাতে অর্পণ করার জন্য অন্য একজন স্ত্রীলোকের শব দেখিয়ে এমির মৃত্যুর খবর প্রচার করা হয় এবং কারাগার হতে চারুকে মুক্তি দেওয়া হয়। মীর্জাপুরের এক দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে দস্যুদের আড্ডায় এই ঘটনা ঘটে। এমির মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া

হচ্ছে দেখে চারুও নদীতে ঝাঁপ দেয়। ইতিমধ্যে চারুর মা তাঁর স্বামীর নির্দেশে মীর্জাপুরে আসেন এবং চারুর শব গঙ্গায় পাওয়া যায়। শোকবিহ্বল প্রতাপচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে এক চিতায় পুড়ে মরবেন বলে স্থির করেন, কিন্তু চিতায় উঠানোর সময় চারুর জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। এমি চারুর মৃত্যুর খবরে বিষ খেয়েছিল। কিন্তু ডাক্তার আসল বিষ দেননি, কাজেই সেও বেঁচে গেল। প্রতাপচন্দ্রের আত্মকথায় জানা গেল যে, বিজয় সিং তার জারজ পুত্র। রেমণ্ড সাহেবের ভগ্নী তাঁর প্রেমিকা ছিলেন। পরে এক সাহেবের সঙ্গে এই শ্বেতাঙ্গিনী প্রেমিকার বিয়ে হয়, কিন্তু প্রতাপচন্দ্র আবার স্বগ্রামে নিজের স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে চান দেখে বিবি রেমণ্ড তাঁর স্বামীকে হত্যা করে মন্নুলাল ওরফে প্রতাপচন্দ্রকে তাঁর উপপতিরূপে চিরকাল থাকতে বলে। মন্নুলাল অস্বীকার করলে সে চীৎকার করে মন্নুলালকেই হত্যাকারী বলে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। পলায়ন করে মন্নুলাল প্রথমে সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং পরে দস্যুদলে যোগ দেয়।

এই সব ঘটনা প্রকাশ পাবার পর বিজয় হেলেনাকে এবং চারুচন্দ্র এমিকে বিয়ে করে সুখে শান্তিতে কাল কাটাতে থাকে। রেমণ্ড সাহেব ইতিমধ্যে খুন হয়েছিলেন, কিন্তু এমির জন্য তিনি প্রচুর টাকা রেখে যান। হেলেনার পরিচয়ে প্রকাশ পায় যে, সে একজন বিদুষী, পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্রাহ্মণকন্যার দ্বিতীয় পতি রেমণ্ডের ঔরসজাত। রেমণ্ড সাহেব তাঁর আর একটি বিয়ের কথা গোপন রেখেছিলেন এবং এমির সঙ্গিনীরূপেই হেলেনাকে পালন করেছিলেন। উপপতি মন্নুলাল ওরফে প্রতাপচন্দ্র এবং জারজ সন্তান বিজয়চন্দ্রের জন্য বিবি রেমণ্ডও অনেক টাকা উইল করে গিয়েছিলেন। উপন্যাসটিতে হেমচন্দ্র ও হেমলতাকে নিয়ে সাব-প্লট জোড়া হয়েছে। উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি এবং বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের একটি চিত্র ও বাঙ্গালী দস্যুদলপতির কেরামতি দেখানো ছাড়া তার আর কোন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না।

সাব-প্লটটি সংক্ষেপে এইরূপ : কৃপারাম গঙ্গোপাধ্যায় একজন ধনী কুলীন। তাঁর ছেলে সুকুমার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। সুকুমারের বন্ধু হেমচন্দ্র কুলীন নয়, কিন্তু সে সুকুমারের ভগ্নী হেমলতাকে ভালবাসে। বাবা বিয়ে দিতে রাজী নন। ইতিমধ্যে সুকুমারকে কাল যক্ষ্মারোগে ধরল। মরার আগে সে গোপনে হেমলতার সঙ্গে হেমচন্দ্রের বিয়ে দিল, কৃপানাথ সে বিয়ে স্বীকার না করে মেয়ের বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন। একেবারে রোমিও জুলিয়েটের কায়দায় দড়ির মই বেয়ে হেমলতা হেমচন্দ্রের সঙ্গে পালিয়ে গেল। হেমচন্দ্র চারুচন্দ্রের বন্ধু। তিনি মীরাটে রওনা হলেন বন্ধুর সাহায্যে চাকরী পাবার আশায়। বিদ্রোহের হাঙ্গামায় পথে আটকে পড়ে হেমলতার সতীত্বে তাঁর সন্দেহ হল। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে দুজনেই মন্নুলাল ওরফে চারুচন্দ্রের বাবার দস্যুদলের হাতে পড়েন। হেমচন্দ্র হেমলতাকে দেখে তাকে 'কলঙ্কিনী' বলায় সে পাহাড় থেকে পড়ে যায়। বাঘে তাকে খেয়েছে মনে করে প্রতাপচন্দ্রের আত্মকথা বর্ণনা কালে তার সতীত্বের প্রমাণ পেয়ে হেমচন্দ্র আত্মহত্যা করতে যাবেন এমন সময় খবর পাওয়া গেল হেমলতা বেঁচে আছেন। তাঁকে বাঘে নয় শিয়ালে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। একজন দস্যু তাঁকে জীবিত দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। অতএব দুই হেমের মধুর মিলন হল এবং এক্ষেত্রেও দেখা গেল হেমলতার ধনবতী মা তার জন্য লক্ষ টাকা রেখে গেছেন। অতএব সকল দিক থেকেই "মধুরেণ সমাপয়েৎ"।

(২) *নানাসাহেব*

'চিত্তবিনোদিনী'র পর সিপাহী বিদ্রোহের পট-ভূমিকায় আর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের সিপাহী

বিদ্রোহ সম্পর্কে মনোভাবের ক্রম বিকাশের দিক থেকে এ বইটির গুরুত্ব আছে। শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র প্রণীত 'নানাসাহেব' প্রকাশিত হয় ১২৮৬ সালের ১১ই ভাদ্র (১৮৭৯, আগস্ট)। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১২৯০ সালের ১লা বৈশাখ। দ্বিতীয় সংস্করণের একটি কপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। প্রথম সংস্করণের কোন কপি আমার চোখে পড়েনি। ডাঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' বইটির উল্লেখ করা হয়নি।

উপন্যাসটির পুরো নাম হল ঃ

ভারতের সুখ স্বপ্ন

নানাসাহেব

বা

[বৃটিশ গৌরব রবি ভারতগগনে]

'টাইটেল পেজ'এ উপন্যাসটিকে 'উপেন্দ্র প্রবন্ধাবলীর প্রথম খণ্ড' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহার সহ ৪২টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত উপন্যাসটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩০। দ্বিতীয় সংস্করণ ৩১৯ নং আপার চিৎপুর রোডস্থিত শ্রীমহেন্দ্রলাল শীলের যন্ত্রে শ্রীবিহারীলাল দের দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য চৌদ্দ আনা। লেখক "ঢাকা বঙ্গ-সাহিত্য সমাজের জনক ও বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান হিতৈষী কুমার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চতুর্ধুরীন্—বাহাদুরস্য" শ্রীকরকমলে উপন্যাসটি উপহার দিয়েছেন।

'নানাসাহেব' দেশপ্রেমে উদ্দীপিত রচনা। ইংরেজ সরকারের বিষ নজরে যাতে না পড়তে হয় তার জন্যে লেখক ইংরেজের জয়গান গেয়েছেন, কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট। সম্ভবতঃ এই কারণেই বইটি সুলিখিত না হলেও পাঠক সমাজে আদৃত হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের মনোভাবের অন্য একটা দিক ছিল এটা তার একটা প্রমাণ।

• 'নানাসাহেব' রচনাকালে লেখকের বয়স ছিল মাত্র ২১ বছর। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ কালে সানন্দে লেখক তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন ঃ—

"এই পুস্তকখানি আমি প্রথম প্রচারকালে এমন আশা করি নাই যে ইহা বঙ্গীয় বুধমণ্ডলীর সমীপে আদরণীয় হইবে কিম্বা ইহাকে দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইবে। কিন্তু সময়ের স্রোতে, রুচির ক্ষণ পরিবর্ত্তনের নিরূপণ করিতে পারে এমন কাহারো সাধ্য নাই। আজকাল দেশে উন্নতির আশা ধমনীতে ধমনীতে ধাবিত হইতেছে। কিসে আমরা হীন হইলাম। কিসে আমরা সর্ব্বস্ব হারাইলাম। কিসে আমাদের আমিত্ব ও সর্ব্বস্ব প্রাপ্ত হইব; এই আশাই আধুনিক উন্নতিশীলগণের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই—'নানাসাহেব' খানি যে সেই শ্রেণীর পক্ষে আত্ম-অবনতির কিঞ্চিৎ প্রকাশক হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।"

ভূমিকায় গ্রন্থকার যা বলেছেন তাঁর উপন্যাসের মূল সুরটিও তাই। নানাসাহেব দেশপ্রেমিক, বিদ্রোহীরা দেশপ্রেমিক, দেশাত্মবোধে অনু-প্রাণিত হয়েই তাঁরা বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার জন্য ভারতের সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে যায়—এই হল লেখকের বক্তব্য। নানা সাহেবের চারিত্রিক দুর্বলতা, বিদ্রোহী নায়কদের অযথা নিষ্ঠুরতা, ইংরাজ-প্রসাদলোভীদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রধানতঃ এই তিনটি কারণেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করেও স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারেনি এই হল উপন্যাসটির প্রতিপাদ্য। কাজেই 'চিত্তবিনোদিনী'র মূল বক্তব্য থেকে 'নানাসাহেব'-এর মূল বক্তব্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

লেখকের অবতরণিকাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ "আজ এই স্তিমিত তেজোসম্পন্ন বঙ্গে স্তিমিত প্রভাবী বঙ্গবাসীর সম্মুখে হৃদয় খুলিয়া কি গাহিতে বসিলাম !! বীর গীত !! ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেবের জীবনবৃত্তান্ত বা ভারতে সুখস্বপ্ন !! না—

'বৃটিশ গৌরব রবি ভারত গগনে।' অবতরণিকায় লেখক কবি হেমচন্দ্র, কবি নবীনচন্দ্র, রামদাস সেন, আনন্দরাম, কৃষ্ণদাস, শিশির কুমার, সুরেন্দ্রনাথ, নবগোপালকে স্মরণ ও আহ্বান করেছেন। বেদনার সঙ্গে বলেছেন: "কি লিখিতে বসিলাম? ভারতের সুখ-স্বপ্ন !! ইহা যথার্থ ভারতের সুখ স্বপ্ন !! নিশীথস্বপ্ন যেমন নিদ্রাঘোরেই দেখা যায়, নিদ্রার বিলীনে লয় পায়—আজ আমার এই স্বপ্নও তেমনি হইবে।"

বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বিষদৃষ্টি এড়াবার জন্য লেখক অবতরণিকার শেষাংশে লিখেছেন:—

"পরিণামে বক্তব্য এই যে, আজকাল ইংরাজ রাজপুরুষগণ বঙ্গ-ভাষার উপরে যেরূপ বিতৃষ্ণ, তাহাতে এই ভীষণ ব্যাপার রচনা করা অসীম সাহসিকতার কার্য্য! সেই কারণে রাজপুরুষগণের নিকটে আমরা করজোড়ে এই ভিক্ষা:—যেমন প্রবল অগ্নিশিখার নিকটে হীন জ্যোতিসম্পন্ন কীটের জীবন প্রদান ভিন্ন জয়লাভ অসম্ভব তেমনি—অপরিপক্ক সামর্থ্যসম্পন্ন নানা সাহেবের প্রভূত পরাক্রমশালী বৃটনীয় গণের বিপক্ষে বিদ্রোহী হওয়াও অসম্ভব হইয়াছিল:—তাহারই কয়েকটি কথা ইহাতে লিখিত হইবে। ইহাতে নানা সূর্য্য অস্ত যাইবে, ভারতের সূর্য্য বৃটেনের দাস হইবে, ভারতরাজেশ্বরী জননী ভিক্টোরিয়ার নাম ভারত সমীরণ গাহিবে। বৃটিশ কেতন বায়ুভরে উড্ডীয়মান থাকিয়া হিমালয়ের অত্যুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে কুমারিকা জনপদবাসীগণের হৃদয়ে বৃটিশ প্রতাপ জাগাইয়া দিবে।"

গ্রন্থকার শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র 'বঙ্গ সংসারের চিত্র' রহস্য প্রতিভার চিত্রকর বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

লেখক তাঁর উপন্যাসকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলে দাবি করেননি, যদিও মূলতঃ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অবলম্বনেই উপন্যাসটি লিখিত। ইতিহাস, জনশ্রুতি, গালগল্প, কল্পিত ঘটনা সব মিলিয়েই বইটি লেখা হয়েছে। উচ্ছ্বাস, বিশেষ করে বক্তৃতার ঘটা খুব বেশী। কখনও

ভারতলক্ষ্মী, কখনও বৃটেনলক্ষ্মী আকাশে আবির্ভূত হচ্ছেন এবং বাণী দিচ্ছেন। নানা সাহেব উপন্যাসের নায়ক। তবে লেখক ইতিহাস পড়ার ব্যাপারে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করেছেন বলে মনে হয় না। "ইতিহাসের উপাখ্যানভাগ" তিনি সংগ্রহ করেছেন জি. ও. ট্রেভলিয়ান সাহেবের 'কানপুর' (Cawnpore) নামক পুস্তক থেকে। পুস্তকটি ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। আজিমুল্লা, তান্তিয়া তোপী প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। ইংরেজরা বাজীরাও-এর পোষ্যপুত্র নানা সাহেবকে উপযুক্ত মর্যাদা না দেওয়ায় নানা সাহেবের ক্ষোভ এবং এই ক্ষোভ থেকে সিপাহীদের অসন্তোষের সুযোগ গ্রহণ করে নানা সাহেবের স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প—এই হল উপন্যাসের সূচনা।

নানাসাহেবের স্বপ্ন যখন সফল হতে চলেছে তখন প্রধানতঃ দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তেই ভারত আবার ইংরাজের পদানত হয় এই জিনিসটিই লেখক বিশেষ করে দেখিয়েছেন। দেশদ্রোহী, পুরস্কারের আশায় বিদেশী শত্রুর পদলেহী নানকচাঁদের চরিত্র লেখক মোটামুটি ভালই ফুটিয়েছেন।

"...... ভারত পরিকল্পনাকারী বিদ্রোহানলের নির্বাণও একমাত্র নানকচাঁদের দ্বারা সমাহিত হইয়াছিল। নানকচাঁদ কোন জাতীয় ও কোন দেশীয় ছিলেন একথা আমরা কোন ইতিহাসে দেখিতে পাই নাই। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি বঙ্গবাসী ও ইংরাজ ভাষাভিজ্ঞ হিন্দু ছিলেন।"

'চিত্রবিনোদিনী'র লেখক শিক্ষিত বাঙ্গালীর যে চরিত্র যেভাবে এঁকেছেন 'নানাসাহেবে'র লেখক তেমনই একটি চরিত্রকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে এঁকেছেন। এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত।

জ্ঞাতিভ্রাতা বল্লারাও-এর প্রেমিকার রূপে নানা সাহেব মুগ্ধ হলেন এবং বল্লারাও-এর প্রেমের কথা না জানা থাকায় নানা সাহেব তাকে পাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠলেন এই কাহিনীর অবতারণা করে লেখক

নানা সাহেবের চারিত্রিক দুর্বলতা দেখিয়েছেন। দেশদ্রোহী নানকচাঁদ তার চর চুয়া এবং বল্লারাও-এর গুরু শিবপ্রসাদ স্বামীর সাহায্যে নানা সাহেবের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে কিভাবে ইংরাজদের জয়লাভে সহায়তা করেছিল তাও লেখক দেখিয়েছেন। নানা সাহেবের চারিত্রিক দুর্বলতা না থাকলে দেশদ্রোহীরা সফলকাম হতে পারত না এই ইঙ্গিত লেখক স্পষ্টভাবেই দিয়েছেন। নানা সাহেবের চারিত্রিক দুর্বলতা সম্পর্কে লেখক নবম পরিচ্ছেদের পাদটীকায় লিখেছেন—"ইতিহাসে জানা যায় যে, নানা প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজা হইলে একটি আত্মীয় লইয়া তাঁহার গৃহ বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়।"

নানা সাহেবের প্রথম সাফল্যের চিত্রটি যেভাবে আঁকা হয়েছে সেটিও উল্লেখযোগ্য। কর্ণপুর বা কাণপুর অধিকৃত হলে ঝান্সীর রাণী নিজে নানা সাহেবের মাথায় মুকুট পরিয়ে দেবার পর তাঁর সখীরা গাইলেন ঃ

"আজিকে ভারতবাসী আনন্দে মাতহ সবে ॥
স্বাধীনতা সুশোভিত—হেনকাল পাবে কবে ॥
ঐ দেখ দিনমণি—গগনে উঠি আপনি,
বিতরে সুবর্ণপ্রভা আমোদে মাতিয়া ভবে ॥
ভারতের জয় বলি—হও সবে কুতূহলী।
ভুবন কাঁপাও মিলি—জয় জয় জয় রবে ॥"

উপন্যাসের ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ থেকে উপসংহার পর্যন্ত নানা সাহেবের পতন এবং বৃটিশের বিজয়লাভের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই অংশে কয়েকটি জিনিস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ গ্রন্থকার লিখেছেন ভারতীয়দের সমর্থনে তুরস্কাধিপতি ইজিপ্টের 'পাচা'কে (পাসা) বৃটিশ সৈন্যদের ভারত যাত্রায় বাধা দেবার জন্য পত্র দেন এবং তদনুযায়ী ইজিপ্টাধিপতি বৃটিশ রণতরীসমূহের উপর গোলাবর্ষণ করে রণতরী ডুবিয়ে দেন এবং ৩৫ হাজার ইংরাজ সৈন্যের ভারত অভিযান ব্যর্থ হয়।

এই তথ্য লেখক পেয়েছেন বিদ্রোহীদের ইস্তাহার থেকে।

দ্বিতীয়তঃ, লেখক দেখিয়েছেন তান্তিয়া তোপীর নৃশংসতাই বিদ্রোহীদের পতনের অন্যতম কারণ। এ ব্যাপারে নানাসাহেবকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করেননি।

তৃতীয়তঃ, বৃটিশ সেনাপতি হ্যাভলকের সামনে ঝান্সীর রাণী অগ্নি-কুণ্ডে আত্মবিসর্জন করলেন এই কল্পিত দৃশ্যের অবতারণা করে লেখক ঝান্সীর রাণীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন ঃ

"প্রিয়তম সেনাগণ! তোমরা আমাকে জননী বলিয়া মান্য করিতে। আজ পুত্রের কার্য্য কর। তোমাদের জননী স্বর্গে চলিল, ভারত স্বাধীন করিতে পারিল না বলিয়া স্বর্গে চলিল। তোমরা যত দিবস জীবিত থাকিবে, ভারতকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিতে ভুলিও না।" দেশপ্রেমের উদ্দীপনাময় এই রকম চিত্র লেখক আরও এঁকেছেন।

শেষ পর্যন্ত নানা সাহেব ও বল্লারাও সেনাপতিরূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই উপলক্ষে লেখক একটি কবিতা কাহিনীর মধ্যে যোগ করেছেন। রণরঙ্গে অবতীর্ণ বল্লারাও সৈন্যদের আহ্বান করে বলছেন ঃ—

"শুন সবে এক মনে ভারত সন্তান।
দাও প্রাণ চাও যদি ভারতের মান;
কামানের রোল নয়, স্বর্গ শঙ্খনাদ,
রণের বাজনা নয়, অমৃত আস্বাদ,
পিতামাতা আত্মীয়ের ত্যজ স্নেহপাশ,
যদি সবে কায়মনে স্বর্গ কর আশ,
ক্ষত্রিয় কুলেতে সবে জনম লভিয়া,
ভুবন বিখ্যাত যশঃ দিবে ভাসাইয়া,
হইবে ভারতী সতী যবনের দাসী,
দেখিবে তোমরা সবে হে ভারতবাসী;
কোথায় বৃটেন আর? কোথায় ভারত!
সে বৃটেনবাসী আজ লইল ভারত!!

চতুর্থতঃ বৃটিশের জয় এবং নানা সাহেবের পলায়ন কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে লেখক দেশদ্রোহী নানক চাঁদকে তার যোগ্য শাস্তি দিতে ভোলেননি। উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদে 'নানক চাঁদের পরিণাম' বর্ণিত হয়েছে। ইংরেজদের কৃপায় দেশদ্রোহের পুরস্কারস্বরূপ নানকচাঁদ বিঠুরের সিংহাসন লাভের আশায় ছিল। একজন সিপাহী তার সব আশায় ছাই দিল। সিপাহী কহিল: "তোমাকে যমালয়ে যাইতে হইবে সেই কথা বলিতে আসিয়াছি। রে কলঙ্কি! তুই না আর্য্যের সন্তান; একা তুই গৃহের শত্রু হইয়া গৃহ ভস্ম করিলি।"

এইসব বলে সিপাহী গলায় দড়ির ফাঁস দিয়ে নানক চাঁদের ইহলীলা সাঙ্গ করল।

উপন্যাসের শেষদিকে বল্লারাও এবং তার প্রেমিকা অহল্যার মধুর মিলন দেখানো হয়েছে এবং শিবপ্রসাদ স্বামীকে সন্ন্যাসী করে দেশদ্রোহের কঠোর শাস্তি থেকে নিস্কৃতি দেওয়া হয়েছে। তারপর যথারীতি রাণী ভিক্টোরিয়ার জয়গান গাওয়া হয়েছে।

সিপাহী বিদ্রোহকে মসীবর্ণে চিত্রিত করে এবং ইংরাজ শাসনের জয়গান গেয়ে গোবিন্দ দত্ত 'চিত্তবিনোদিনী' নামে যে উপন্যাস লেখেন তা তুলনায় অনেক ভাল লেখা হলেও তার একাধিক সংস্করণ হয়নি। পক্ষান্তরে মাত্র ৫।৬ বৎসর পরে ২১ বৎসর বয়স্ক একজন অখ্যাত তরুণের লেখা 'নানাসাহেব'এর দুইটি সংস্করণ হওয়া একটু বিচিত্র বৈকি! সিপাহী বিদ্রোহের সময় ও পরে শিক্ষিত হিন্দু বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের ভাবনা চিন্তার আর একটা দিকের পরিচয় বইটিতে উদ্ঘাটিত হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তা রচনা যতই নিকৃষ্ট হোক এবং লেখক যতই অখ্যাত হোন।

(৩) চন্দ্রা

বাংলা দেশের অন্ততঃ একজন বিখ্যাত লেখক ঊনবিংশ শতকে ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

এই উপন্যাসের নাম হল 'চন্দ্রা' এবং এর লেখক হলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও নটকুলচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এটা খুব আশ্চর্য কথা যে, বাংলার পণ্ডিতজনেরা এখবর রাখেন না এবং যদিও বা কেউ কেউ রেখে থাকেন তো তাঁরা কেন জানি না—মহাবিদ্রোহের শত বার্ষিকী-কালে এ সম্বন্ধে বিস্ময়কর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। গিরিশ-সাহিত্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে 'চন্দ্রা'র সপ্রশংস উল্লেখ করে বলেছেন, "...'চন্দ্রা' উপন্যাস অতি উচ্চশ্রেণীর কথা-সাহিত্য।" গিরিশচন্দ্রের এই উপন্যাসটির দিকে সর্বপ্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 'স্বাধীনতা'র রবিবাসরীয় বিভাগের সহ-সম্পাদক আমার স্নেহভাজন অরুণ রায়। তিনি উদ্যোগী না হলে গ্রন্থটি দীর্ঘকাল আমারও অগোচরে থেকে যেতো। 'চন্দ্রা' ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় 'কুসুম মালা' মাসিক পত্রিকায় ১২৯১ সালে (ইং ১৮৮৪ খৃস্টাব্দ) বঙ্গদর্শনে 'আনন্দমঠ' সমাপ্ত-হবার দুবছর পরে। স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে গিরিশচন্দ্রের কোন উপন্যাসই প্রকাশিত হয়নি, এটিও হয়নি। বসুমতী কার্যালয় থেকে ১৩১৮ সালে প্রকাশিত গিরিশ গ্রন্থাবলীর নবম ভাগে 'চন্দ্রা' স্থান পায়। 'চন্দ্রা' ছাড়া 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ১৩০৫-৬ সাল) 'ঝালোয়ার দুহিতা' এবং নাট্যমন্দির পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ১৩১৭-১৮) 'লীলা' নামে গিরিশচন্দ্রের দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

'চন্দ্রা' উপন্যাসটি দশটি বিভাগে মোট ৩৩টি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। বসুমতী সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৯।

গিরিশচন্দ্র বাংলা ১২৫০ সনের ১৫ই ফাল্গুন (ইং ১৮৪৪ খৃস্টাব্দ, ২৮শে ফেব্রুয়ারী) জন্মগ্রহণ করেন। বালক বয়সে মহাবিদ্রোহের অভিজ্ঞতা তাঁর কিছুটা হয়েছিল, তার বর্ণনা তিনি নিজের জীবনকথায় বর্ণনা করে গেছেন। পরবর্তীকালে মহাবিদ্রোহকে নিছক সিপাই বিদ্রোহ হিসাবে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামরূপেই তিনি সিপাই বিদ্রোহকে দেখেছিলেন এবং 'চন্দ্রা'য় তাঁর সেই বিশ্বাসের স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন।

পরাধীনতার জ্বালা গিরিশচন্দ্র বড় তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। এ জ্বালা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর 'সিরাজউদ্দৌলা' 'মীরকাসিম' এবং 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকে। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিষদৃষ্টি পড়েছিল গিরিশচন্দ্রের উপর। ১৯১১ খৃস্টাব্দে গভর্নমেণ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি করছে বলে উল্লিখিত তিনটি নাটকের অভিনয়, বিক্রয় এবং পুনর্মুদ্রণ বন্ধ করে দেয়। এ সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র 'ঝান্সীর রাণী' নাটক লিখতে সুরু করেন। দুই অঙ্ক লেখা শেষ হবার পর কথা প্রসঙ্গে একজন পদস্থ পুলিস কর্মচারী তাঁকে ঐতিহাসিক নাটক লিখতে নিষেধ করেন। (গিরিশচন্দ্র ২য় ভাগ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১১৬) মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় লিখিত 'চন্দ্রা' উপন্যাসটির রচনাভঙ্গী এবং ঘটনাবিন্যাস লক্ষ্য করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দেবার ইচ্ছা গিরিশচন্দ্রের ছিল।

গিরিশচন্দ্র খুব পড়াশুনা করতেন। বিদেশী কোন বই তাঁর বাদ যেত না। মনে হয় পুশকিনের রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদও তিনি পড়েছিলেন। 'চন্দ্রা' উপন্যাসে পুশকিনের 'ক্যাপ্টেন'স ডটারের' (ক্যাপ্টেনের মেয়ে) প্রভাব বেশ স্পষ্ট। তবে 'ক্যাপ্টেনের মেয়ে' মিলনাত্মক এবং 'চন্দ্রা' বিয়োগাত্মক। দুটি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমির পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে গিরিশচন্দ্র যে তাঁর উপন্যাসকে সঠিকভাবে শেষ করেছেন এ-বিষয়ে বোধহয় কোন দ্বিমত হবে না।

পুশকিন 'ক্যাপ্টেনের মেয়ে'র পটভূমিকারূপে গ্রহণ করেছেন পুগাচেভের নেতৃত্বে পরিচালিত ১৭৭৩-৭৫ খৃস্টাব্দের রুশিয়ার কৃষক বিদ্রোহকে। গিরিশচন্দ্র 'চন্দ্রার' পটভূমিরূপে গ্রহণ করেছেন ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ভারতীয় মহাবিদ্রোহকে। ক্যাপ্টেনের মেয়ে মারিয়া ইভানোভনার ভারতীয় সংস্করণ হল চন্দ্রা এবং গ্রিনেভের ভারতীয় সংস্করণ হল হারান ওরফে সোমনাথ। দয়াবতী রুশ সম্রাজ্ঞীর চরিত্র গিরিশচন্দ্রের তুলিতে লেডী ক্যানিং-এর রূপ নিয়েছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক

অবস্থার সাদৃশ্য ও পার্থক্য অনুযায়ী গিরিশচন্দ্র ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্র সৃষ্টিতে স্বাধীন ও সঠিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের চরিত্রে 'আনন্দমঠে'র প্রভাব সুপরিস্ফুট।

সেন্সর ব্যবস্থার কড়াকড়ির জন্য পুশকিন পুগাচেভ বিদ্রোহের পূর্ণ ঐতিহাসিকরূপ আঁকতে পারেননি, তবু পারিবারিক কাহিনীর সীমাবদ্ধতার মধ্যে ভূমিদাস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুশ চাষীদের অভ্যুত্থানের কিছুটা ছবি এবং সেই অভ্যুত্থানের নেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে পুশকিন সক্ষম হয়েছেন।

গিরিশচন্দ্রও সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশে আবদ্ধ অবস্থায় পারিবারিক কাহিনী এবং প্রেমের কাহিনীর মধ্যে নিজের রচনা সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন। তবু বিদ্রোহের মোটামুটি চিত্র ও চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে তিনি ভয় পাননি।

এখন 'চন্দ্রার' মূল কাহিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। রামচাঁদ খুড়ো সাধারণ মানুষ, মদ গাঁজা টানে, কিন্তু লোকটি একেবারে খারাপ না। হৃদয় বলে একটা জিনিস তার আছে। গাঁজার লোভে মড়া পোড়াতে যায় শ্মশানে। মৃত্যুভয়ে তার বৈরাগ্যোদয় হল এবং গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়ানোর সময় মৃত ভ্রমে এক নারী কর্তৃক গঙ্গাবক্ষে নিক্ষিপ্ত একটি শিশুকে সে বুকে তুলে নিল। দানোয় পাওয়া ছেলে আনার অপরাধে সামাজিক শাস্তি এবং পুলিসের বাহাদুরির ফলে চোর সাব্যস্ত হয়ে বিনা অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করে রামচাঁদ বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তার স্ত্রী শান্তা ও পালিত পুত্র হারান বহু দুঃখ ভোগ করল এবং শেষ পর্যন্ত হারানকেও পালিয়ে যেতে হল। স্বামী ও পুত্রহারা শান্তা ঘটনাচক্রে তার পালিত পুত্রের উন্মাদিনী মার পরিচারিকা হিসাবে আশ্রয় পেল। ইতিমধ্যে দেশব্যাপী বিক্ষোভের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে সুরু করেছে। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রচার চলছে। এক সন্ন্যাসী যুবক সৈন্যদের কাছে গান গেয়ে ও বক্তৃতা দিয়ে তাদের জাগাবার চেষ্টা করছেন। গান হচ্ছে :

উঠ, উঠ, উঠ—কি কর, কি কর !
ধর, ধর, ধর, ধর অসি ধর !
মাতৃভূমি জয় জয় জয় !
ধিক্ ধিক্ ধিক্ প্রাণে।
ঘুচিল ঘুচিল ধর্ম্মকর্ম্ম, তাপশুষ্ক
নিহত মর্ম্ম,
মজিল মজিল মান—
হা ! হা ! বক্ষে বাজে ! (সারঙ্গ ধামার)

কালক্রমে হারাণ বড় হয়ে দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী হয়েছে। তার নাম এখন সোমনাথ। সোমনাথদের গুরুই বিদ্রোহীদের নেতৃস্থানীয়। ইংরাজদের সঙ্গে সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে বিরোধের ফলে এবং স্ত্রী একজন ইংরাজ সেনাপতির সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত এই মিথ্যা সন্দেহে সোমনাথদের গুরু ইংরাজ-বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন এবং স্ত্রী ও কন্যাকে ত্যাগ করে চলে যান।

সাবিত্রী পাগলিনী বেশে স্বামীর সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরতে থাকেন এবং কন্যা চন্দ্রা মিশনারীদের দ্বারা লালিতা পালিতা হয়। গঙ্গাবক্ষে ঝড়ের ফলে নৌকা ডুবি হয়। জলমগ্ন চন্দ্রাকে সোমনাথ রক্ষা করে এবং উভয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়। কিন্তু সোমনাথ সন্ন্যাসী এবং বিদ্রোহী, কাজেই মিলন সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে যে জমিদারের বাড়ীতে হারান ওরফে সোমনাথ এবং তার পালিতা মা শান্তা কাজ করত সেই জমিদারের ছেলে রমানাথ চন্দ্রার রূপে পাগল হয়ে ওঠে। চন্দ্রাকে পাওয়ার জন্যে সে অনেক কাণ্ড করে এবং শেষ পর্যন্ত জেলে যায়। চন্দ্রা সোমনাথকে বহু বিপদ থেকে বাঁচায়। কিন্তু রমানাথের টাকার লোভে ডাকাতের দল চন্দ্রাকে অপহরণ করতে গেলে সোমনাথের সঙ্গে তাদের লড়াই হয় এবং আহত সোমনাথকে পুলিস ডাকাত সন্দেহে আটক করে।

এই সময় ভারতবর্ষের নানা স্থানে আগুন লাগতে থাকে, বাংলায় অগ্নিকাণ্ড ও ডাকাতী দুই-ই সমভাবে বৃদ্ধি পায়। বিদ্রোহীরাই এই ভাবে অশান্তির আগুন জ্বালাচ্ছিল। নানা সাহেব এবং আজিম উল্লার সঙ্গে দেখা করে সোমনাথদের গুরু তাঁদের বিদ্রোহে উত্তেজিত করেন। পঞ্চম বিভাগের প্রথম পরিচ্ছেদে এই সাক্ষাৎকারের আগে নানা সাহেব সাহেবদের যে খানা-পিনা দিচ্ছেন তার ছবিটি চমৎকার আঁকা হয়েছে। সাহেবদের মনোভাব কেমন তা দেখানো হয়েছে কয়েকটি লাইনে :

"গানের পর কেহ নানা সাহেবকে বলিলেন, 'তুমি পরম দোস্ত'। কেহ বলিলেন, 'তাঁহার অন্তরের লোক'। কেহ বলিলেন, 'লম্বা জীবন' Long life ! আর প্রকাশ্যে কতরকম বলিলেন, কিন্তু মনে মনে একটি কথা, 'Damn the nigger' !"

ইতিমধ্যে রামচাঁদ দুর্দ্ধর্ষ দস্যুরূপে এক বিরাট দল গড়েছে। কিন্তু স্ত্রী শান্তা এবং পালিত পুত্র হারানের কথা সে ভুলতে পারেনি। স্ত্রী ও পুত্র পাবে এই আশা দিয়ে বিদ্রোহীরা তাদের দলভুক্ত করে নেয়। ঘটনাচক্রে সোমনাথ মুক্তিলাভ করে এবং রমানাথও ছাড়া পায়। ব্যারাকপুরে সিপাহীদের উত্তেজিত করার ভার ছিল রামচাঁদের উপর। মোঙ্গল পাঁড়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। কিন্তু রামচাঁদ দস্যু, মনেপ্রাণে সে বিদ্রোহী হয়নি। এক ভিখারিণী অর্থাৎ সোমনাথের গুরুর স্ত্রী এ খবর রাখতেন। তিনি সোমনাথকে সতর্ক করে দিলে সোমনাথ পালায়। এদিকে রামচাঁদও প্রথমে কেল্লায়, পরে বেথুন স্কুলে যেয়ে হিয়ারসে সাহেবকে আসন্ন বিদ্রোহের খবর দেয়। হিয়ারসে কেল্লায় ঢুকে দেখেন মোঙ্গল পাঁড়ে উন্মত্তের ন্যায় গুলি ছুঁড়ছে। পরে সে নিজেকে গুলি করে পড়ে যায়। হিয়ারসের সঙ্গে রামচাঁদের আলাপ হয় তখন চন্দ্রা সেখানে ছিল। সে পাগলের মত সোমনাথকে রক্ষা করার জন্যে বেরিয়ে পড়ে। সোমনাথের নৌকার পিছন পিছন যাবার সময় রামচাঁদ গোরা সৈন্যসহ তাদের পিছু নেয়। সোমনাথের পরিত্যক্ত পোশাক পরে নৌকার ছাদে বসে চন্দ্রা রামচাঁদকে

বিভ্রান্ত করে এবং নৌকা থেকে নেমে ডফ সাহেবের বাড়ী যাওয়ার সময় গোরারা সোমনাথ ভেবে তাকে ধরতে যেয়ে বেকুব হয় এবং রামচাঁদকেই কয়েদ করে।

এর পর বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। সোমনাথের সন্ধানে চন্দ্রা, চন্দ্রার সন্ধানে রামনাথ, বিদ্রোহী সন্ন্যাসী গুরুর সন্ধানে তার পরিত্যক্তা পাগলিনী স্ত্রী সকলেই বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হয়। চন্দ্রাকে গুপ্তচর মনে করে রামচাঁদ তাকে ফিরিঙ্গি মেয়ে বলে একদল মুসলমানের হাতে দেয়, কিন্তু রমানাথের কৌশলে চন্দ্রা রক্ষা পায়। এখানে চন্দ্রা সোমনাথের প্রেমাকাঙ্ক্ষী জেনে রমানাথের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার সঙ্কল্প সে গ্রহণ করে। যুদ্ধ চলতে থাকে। ভিখারিণীর কাছ থেকে অনেক গোপন খবর পেয়ে ইংরাজরা সাফল্য লাভ করে। স্বামীর নিষ্ঠুরতায় রুষ্ট হয়েই ভিখারিণী ঐ সব খবর দেয়। যুদ্ধে সোমনাথদের গুরুর মৃত্যু হয় এবং ভিখারিণীও বুকে ছুরি মেরে আত্মহত্যা করে। সোমনাথ ও রমানাথ অসামান্য বীরত্বের সঙ্গে লড়ে এবং রমানাথ মৃত্যুর আগে সোমনাথকে বলে যায় চন্দ্রা সতী এবং সে যেন চন্দ্রাকে বিয়ে করে।

রামচাঁদ নানা সাহেবকে ফাঁদে ফেলেছিল, চন্দ্রার জন্যে নানা সাহেব বেঁচে যান। সন্ন্যাসীবেশধারী সোমনাথ গুরুর কথা অনুযায়ী রামচাঁদকে হত্যা করার জন্যে তার সঙ্গে অসিযুদ্ধ আরম্ভ করেছে এমন সময় শান্তা ছুটে আসে। শান্তা হারান ওরফে সোমনাথকে চিনতে পেরেছিল, এই সময় নানা সাহেব পিছন দিক থেকে গুলি করে দেশদ্রোহী রামচাঁদকে হত্যা করলেন।

অষ্টম বিভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদে হেভেলকের বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ বর্ণনার গোড়ায় যে ইংরাজী কবিতাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তাও উল্লেখযোগ্য :

Strike till the last warmed
foe expire !

Strike for your alter and
your fires !
Strike for green graves
of your sires !
God and your native land !

সোমনাথকে বাঁচাতে যেয়ে চন্দ্রা গোরার গুলিতে আহত হয়। সোমনাথের গুরুর নৃশংস আদেশ পালন না করায় একজন ইংরাজ মহিলা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় সোমনাথও বেঁচে যান। সোমনাথ, তার মা শান্তা এবং চন্দ্রাকে কলকাতায় চালান দেওয়া হয়। লর্ড ক্যানিং-এর কাছে দয়া ভিক্ষা করে চন্দ্রা সোমনাথকে বাঁচায়, কিন্তু মায়ের শেষ চিঠি পড়ার পর চন্দ্রা আর সোমনাথের সঙ্গে দেখা করল না। প্রত্যাখ্যাত সোমনাথ উদাসীন হয়ে গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়ানোর সময় তার পাগলিনী মাকে ফিরে পায়। চন্দ্রার বাড়ী থেকে চন্দ্রার আঁকা সোমনাথের ছবি নিয়ে তার মা এক সময় পালিয়ে এসেছিল। সেই ছবি বুকে করেই সে ঘুরে বেড়াত। সোমনাথকে দেখে চিনতে পেরে ছবিটি ফেলে দিয়ে সে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে।

চন্দ্রা মিশনারীদের কাছে মানুষ হয়েছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা তাকে বিদ্রোহের প্রতি বিমুখ করেছিল, আবার শৈশবে মায়ের পূজারতা মূর্তিটিকেও সে কখনও ভুলতে পারেনি, তাই সহস্র উপরোধ অনুরোধেও সে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেনি। বোধহয় রমানাথের প্রেম ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করে সে সোমনাথকেও গ্রহণ করতে পারল না, বিবাগিনী হয়ে গেল। চন্দ্রা কি মহাবিদ্রোহকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের দোটানা মনেরই প্রতীক এমন প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়।

(৪) ঝান্সীর রাণী

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ইতিহাসের একটি বিশেষ অংশ অবলম্বন করে চণ্ডীচরণ সেন 'ঝান্সীর রাণী' নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে। 'টম কাকার কুটির' প্রণেতা রূপে চণ্ডীচরণ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং 'টম কাকার কুটির' নামে মিসেস বীচার স্টোর 'আংকেল টমস কেবিন' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ অনুবাদকালেই এদেশের কুপ্রথা ও কুশাসন সকলকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের আবশ্যকতা তিনি উপলব্ধি করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দেশের অবস্থা এবং কোম্পানীর কুশাসন ইত্যাদি বর্ণনা করে চণ্ডীচরণ কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। এইগুলির মধ্যে সম্প্রতি একমাত্র 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' (১৮৮৬) পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এবং বাকীগুলি প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে।

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত 'ঝান্সীর রাণী' চণ্ডীচরণের শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'এই কি রামের অযোধ্যা' প্রকাশিত হবার সাত বছর আগে প্রকাশিত হয়। 'ঝান্সীর রাণী'র আগে মহাবিদ্রোহের ইতিহাস অবলম্বনে কালীপ্রসন্ন দত্তের 'বিজয়' (১৮৮৩) প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটির এখনও কোন সন্ধান পাইনি। 'ঝান্সীর রাণী'ও দুষ্প্রাপ্য। বন্ধুবর ডাঃ মহাদেব প্রসাদ সাহা তাঁর পুস্তকসংগ্রহ থেকে এককপি উদ্ধার করে আমাকে দেওয়ায় আমার অনেক কষ্ট লাঘব হয়েছে।

'ঝান্সীর রাণী' বৃহদাকার উপন্যাস। ৩৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই উপন্যাসে উপসংহার ছাড়া ৪৪টি অধ্যায় আছে। চণ্ডীচরণ এই উপন্যাসে রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রকৃত চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন:

"ইংরেজ ইতিহাসলেখকগণ ঝান্সীর রাণী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈর চরিত্র

অনর্থক কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ঝান্সীর হত্যাকাণ্ড রাণীর আদেশানুসারে হয়। কিন্তু ঝান্সীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যে রাণীর সংশ্রব ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও প্রমাণ নাই।

রাণী লক্ষ্মীবাঈর ন্যায় বীরাঙ্গনা ইংলণ্ডে কিম্বা আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করিলে, প্রত্যেক লোক আপন আপন গৃহে যত্ন সহকারে তাঁহার প্রতি-মূর্ত্তি রাখিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের লোক এখন পর্য্যন্তও রাণী লক্ষ্মীবাঈর গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।"

চণ্ডীচরণ দেশপ্রেমিক। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থাৎ অর্থগৃধ্নু ইংরাজ বণিক-শাসকদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারূপে গ্রহণ করেছিলেন। সিপাহীদের নৃশংসতা, অন্যায় আচরণ, নানাসাহেব, আজীমুল্লা প্রভৃতি নেতাদের নিষ্ঠুরতা তিনি সমর্থন করেননি, কিন্তু ভারতবাসীর পাপস্খলনের জন্য বিদ্রোহের প্রয়োজন হয়েছিল এই ছিল তাঁর প্রতিপাদ্য। চণ্ডীচরণ তাঁর সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উপর জোর দিয়েছেন এবং আপাতঃ ব্যর্থতার পশ্চাতে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রয়েছে তা স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। ঝান্সীর রাণীর কলঙ্ক অপনোদন করতে যেয়ে তিনি রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর বীরত্ব, দৃঢ় সংকল্প, ন্যায়পরায়ণতা, ধর্মভীরুতা প্রভৃতি দিকগুলি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ অধ্যায়ের মধ্যে মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে চণ্ডীচরণ তাঁর মনোভাব বৃদ্ধ ও যুবকের কথোপকথনের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। তান্তিয়া তোপীকে চণ্ডীচরণ দেশের স্বাধীনতাকামী বীর যোদ্ধারূপেই দেখেছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে শুধু তান্তিয়া তোপীর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

বৃদ্ধ যুবককে বলছেন :

"বাছা! তান্তিয়া নানা সাহেব কিম্বা দিল্লীর বাদশাহের উপকারার্থে যুদ্ধ করিবেন না। দেশের শাসনকার্য্যে এই উদার রাজনীতি প্রবর্ত্তন করাইবার উদ্দেশ্যেই কেবল তিনি যুদ্ধ করিবেন। এ যুদ্ধে তান্তিয়া

পরাজিত হইলেও এ সমরানল কখনও নির্বাপিত হইবে না। পুরুষ পরম্পরায় শত শত তান্তিয়া এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এ আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখিবে। যে পর্য্যন্ত ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই উদার রাজনীতি অবলম্বন করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন, ততদিন আর এ আগুন নির্ব্বাণ হইবে না।" —(পৃঃ ১৫১-১৫২)

চণ্ডীচরণের বক্তব্যের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর মনের দ্বন্দ্বের পরিচয় সুপরিস্ফুট। ঝান্সীর রাজা গঙ্গাধর রাও-এর উপপত্নীর বৃদ্ধ পিতা নারায়ণ ত্রিম্বাক (ত্র্যম্বক) শাস্ত্রীর মুখ দিয়ে যা বলানো হয়েছে সে সবই দেশের মুক্তিকামী এবং হিন্দু সমাজের আমূল সংস্কারকামী চণ্ডীচরণ সেনেরই বক্তব্য। যুবক যোগিরাজ নামক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী (আসল নাম যোগেশ) শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিস্থানীয়। চণ্ডীচরণ সিপাহী এবং সাধারণ মানুষ অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে তাদের বিদ্রোহকে ক্ষিপ্ত শেয়াল কুকুরের আক্রমণের তূল্য বলে মনে করেন, আবার শেষ পর্যন্ত এই আক্রমণ ব্যর্থ হতে বাধ্য একথা বলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থাৎ ইংরাজ শাসকদের কুশাসনের বিরুদ্ধে এরকম বিদ্রোহের প্রয়োজন আছে বলে অনুভব করেন। প্রকৃত পক্ষে নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রী এবং যোগিরাজ তাঁর মনেরই দুটি পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার মধ্যে আপসের প্রতীক।

যুবক যোগিরাজ যখন বলে দেশের মানুষের কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ না হলে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং ইংরাজ বিতাড়নের দ্বারা কোন লাভ হবে না বরং ক্ষতি হবে তখন উত্তেজিত নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রী বলেন :

"সংগ্রামানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া দেশের নৈতিক বায়ু পরিশুদ্ধ না হইলে,—অসংখ্য অসংখ্য লোকের শোণিত দ্বারা বসুন্ধরা সিক্ত, প্লাবিত এবং পরিপুষ্ট না হইলে, দেশীয় জনসাধারণের অন্তরাত্মা সাংগ্রামিক তেজে অনুপ্রাণিত না হইলে, জ্ঞানবীজ এদেশে কখনও অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা নাই।" (পৃঃ ১১৩)

এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেন, "তোমাকে কে বলিল যে, ইংরেজদিগকে আমি তাড়াইয়া দিতে চাই !......দেশে প্রচলিত পাপ, কুসংস্কার এবং উপধর্ম্ম ইংরাজদিগকে এদেশে আনিয়াছে। সেই পাপ, কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মের দুর্গ একেবারে ভূমিসাৎ না হইলে ইংরাজদিগকে কেহ তাড়াইয়া দিতে পারিবে না।"

যোগিরাজ ও নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রীর মধ্যে কথোপকথন প্রসঙ্গে নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রী (চণ্ডীচরণের মুখপাত্ররূপে) যেভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তকে আক্রমণ করেছেন তা উপভোগ্য।

শাস্ত্রী বলছেন ঃ "........তোমাদের বাঙ্গালীদিগের কেবল বক্তৃতা-শক্তিটাই কিছু অধিক......বাঙ্গালীর মুখখানি অক্ষয় কোষ—বীরত্বের খনি,—রেলের গাড়ী,—রাবণের চিতা,—এবং দ্রৌপদীর রন্ধনশালা।"

(পৃঃ ১১৫)

এর আগে শাস্ত্রী বলেছেন ঃ

"....তুমিই তো আবার আমার নিকট বলিয়াছ যে, জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা তোমাদের দেশীয় লোকের কিছুই উপকার হয় নাই। কেবল গভর্ণমেণ্টের চাকুরীর প্রত্যাশায় তাঁহারা একটু ইংরাজি পড়েন। তাঁহাদিগের চরিত্র অতি জঘন্য। তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রাও নৈতিক সাহস নাই।" (পৃঃ ১১৪)

শাস্ত্রীর মারফৎ চণ্ডীচরণ তৎকালীন ব্রাহ্ম নেতাদেরও আক্রমণ করেছেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নাম 'প্রলাপ চন্দ্র' বলে উচ্চারণ করিয়ে শাস্ত্রীর মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে ঃ

"বাছা—বল দেখি তোমাদিগের বঙ্গদেশের লোকেরা কি কেবল এই প্রকার বক্তৃতা করিয়াই সমাজ এবং ধর্ম্ম সংস্কার করিতে সমর্থ হইবেন ?" (পৃঃ ১৪৯) নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রীর অভিধানে 'রায়বাহাদুর' শব্দের নিম্নলিখিত অর্থ দেওয়া হয়েছে ঃ

"রায়বাহাদুর—দেশজ শব্দ (রায়+বাঁদর+ঘঞ্—ধাতু প্রত্যয়ের অর্থ গ্রহণ করিলে মৌলিক অর্থে প্রধান বাঁদর) ব্যবহারানুযায়ী অর্থ চোর কিম্বা দস্যুপুত্র অথবা দেশহিতৈষীর পরিচ্ছেদধারী কপটাচারী।

বিকল্পে সম্ভ্রান্ত লোকদিগকেও বুঝায় ; কিন্তু সে অর্থে এ শব্দ সচরাচর প্রয়োগ হয় না। ব্যবহারানুযায়ীই প্রকৃত অর্থ নিরূপিত হয়।"

'ঝান্সীর রাণী' ঐতিহাসিক উপন্যাস (টাইটেল পেজ-এ ইংরাজীতেও 'A Historical Romance' ছাপা আছে) বলে ঘোষিত এবং মূলতঃ ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হলেও চণ্ডীচরণের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের তুলনায় (সেগুলিতেও বক্তৃতা, ত্রিকাল-দর্শী ঋষি বা মহাপুরুষদের অলৌকিক কার্যকলাপ বা অন্যান্য অসম্ভব ঘটনা স্থান পেয়েছে) এর কাঠামো অনেক দুর্বল। সমাজসংস্কার, দেশের পাপাচার দূরীকরণ ইত্যাদি ব্যাপার দিয়ে বক্তৃতা উপন্যাসটির প্রায় অর্ধেক জায়গা জুড়ে আছে। দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে আজগুবি রকমের কল্পিত কাহিনী ঢোকানো হয়েছে। যেমন যোগেশ ওরফে যোগিরাজ নামক একটি বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর কাহিনী। 'বোম্বে নেটিভ ওপিনিয়ন' (৯ই জানুয়ারী, ১৮৭০) নামক একটি পত্রিকায় উল্লিখিত আনন্দাশ্রম স্বামী নামক জনৈক বাঙ্গালী রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর উল্লেখ করে (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর কচ্ছের মান্ধাবী নগরে এঁর মৃত্যু হয়) লেখক বলেছেন যে, যোগিরাজ আনন্দাশ্রম স্বামী নন। যোগিরাজের পরিচয় 'ঝান্সীর রাণী'র 'যোগিরাজের দৈনিক পুস্তক' (অথবা India Under the Crown) নামক দ্বিতীয় খণ্ডে দেবেন বলে চণ্ডীচরণ আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় খণ্ড আর প্রকাশিত হয়নি।

তৃতীয়তঃ, নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রী নামে রাণী লক্ষ্মীবাই'এর সপত্নী গঙ্গা বাই'এর পিতার যে চরিত্র খাড়া করা হয়েছে ইতিহাসে তেমন কোন চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না, তবে মহারাজ গঙ্গাধর রাও'এর রাজত্ব-কালে নারায়ণ শাস্ত্রী নামে একজন দুঃসাহসিক ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ভাঙী রমণীর প্রেমে পড়েছিলেন এবং সমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে নগর ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, তবু প্রেমিকাকে ত্যাগ করেননি। উগ্র সমাজসংস্কার প্রচেষ্টায় মারাঠী পণ্ডিত নারায়ণ ত্রিম্বাক

শাস্ত্রীকে দিয়ে চণ্ডীচরণ শিবমন্দিরের মধ্যে মুরগীর রোস্ট, কাউলকারী ইত্যাদি খাইয়ে একেবারে অবাস্তব ঘটনার সমাবেশ করেছেন। চতুর্থতঃ, তান্তিয়া তোপী ও ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই-এর মধ্যে প্রেমের সঞ্চারের কাহিনীটিরও কোন ভিত্তি নেই। চণ্ডীচরণ তাঁর আমলে নিশ্চয়ই অনেক ঐতিহাসিক দলিলপত্রের অনুসন্ধান পাননি, তবু কিম্বদন্তী বা নিজের কল্পনার উপর এইসব ক্ষেত্রে তিনি বড় বেশী নির্ভর করেছেন বলে মনে হয়।

যাই হোক, মোটের উপর ঝান্সীর রাণী সম্পর্কে তখনকারকালে যতটা জানা সম্ভব তথ্যের উপর নির্ভর করে চণ্ডীচরণ যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন তাতে বাঙ্গালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রতি এক ধরণের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই মনোভাব লক্ষ্য করার মত। 'ঝান্সীর রাণী'র মূল কাহিনীটি নিম্নরূপ ঃ—ইংরাজের স্বার্থপরতা ও কুশাসনের ফলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবার উপক্রম করছে। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই-এর সঙ্গে ইংরাজরা দুর্ব্যবহার করার ফলে তিনি অসন্তুষ্ট। ঝান্সীর মহারাজা গঙ্গাধর রাও-এর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পত্নী থাকেন। একজন গঙ্গাবাই (এঁকে ইংরাজ ইতিহাসলেখকরা গঙ্গাধর রাও-এর উপপত্নী বলে উল্লেখ করেছেন) এবং অপরজন লক্ষ্মীবাই। গঙ্গাবাই কোম্পানীর পেন্সনপ্রাপ্ত চাকুরিয়া নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রীর কন্যা। যোগেশ ওরফে যোগিরাজের সঙ্গে নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রীর পরিচয় হয় এবং শাস্ত্রীর বাড়ীতে অবস্থান-কালে গঙ্গাবাই যোগিরাজের প্রতি আসক্তা হন। বিয়ে দিতে শাস্ত্রীর কোন আপত্তি ছিল না। কারণ তিনি উগ্র সমাজসংস্কারপন্থী, কিন্তু তাঁর মায়ের কৌশলে মহারাজ গঙ্গাধর রাওএর সঙ্গে গঙ্গাবাই-এর বিয়ে হয়ে যায়। এতে সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে শাস্ত্রী দেশবিদেশে পর্যটন করতে থাকেন। মহারাজ গঙ্গাধর রাও-এর মৃত্যুর পর ইংরাজরা ঝান্সী তাদের রাজ্যভুক্ত করতে উদ্যত হলে তিনি যোগিরাজের সহযোগিতায় তাতে বাধা দেবার চেষ্টা করতে থাকেন। এই সময় দেশব্যাপী বিদ্রোহ

উপস্থিত হয় এবং ঝান্সীতে সিপাহীরা ইংরাজদের হত্যা করে। এর পর লক্ষ্মীবাই সিপাহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাদের সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ঝান্সীর রাণী রূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এইভাবে তিনি বিদ্রোহীদের নেত্রীপদে আসীন হন। ইংরাজের অন্যায় আচরণে বিক্ষুব্ধ নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রী বিদ্রোহে সমর্থন জানান। নানা ঘটনা বিপর্যয়ের মধ্যে যোগেশ ওরফে যোগিরাজের সঙ্গে তাঁর বাল্যবন্ধু অবিনাশের দেখা হয়। যোগিরাজ ইংরাজদের নানাভাবে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে ঝান্সীর রাণীরও দোষস্খালনের চেষ্টা করেন। যোগিরাজ ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাইকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। বিধবা গঙ্গাবাইকে বিয়ে করার চেষ্টাও তাঁর ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে ইংরাজ সৈন্যরা বিদ্রোহ দমনের নামে জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই অসাধারণ বীরত্ব সহকারে ফুলবাগে সংগ্রাম করার পর সপত্নী গঙ্গাবাইসহ গোলার আঘাতে নিহত হন। অন্ত্যেষ্টিকালে নারায়ণ ত্রিম্বাক শাস্ত্রী ও যোগিরাজ উপস্থিত ছিলেন। শ্মশানের মাটিতে যোগিরাজ লেখেন :

"অতুল বীরত্ব, শান্ত পবিত্র প্রণয়
অনাদৃত, এ শ্মশানে আজি ভস্মময় ;
অন্ধ দেশ না চিনিল রতন উজ্জ্বলে ;
ভবিষ্যতে যদি কভু নব পুণ্যফলে
নূতন জীবন আর জ্ঞানদৃষ্টি লভে,
ফুলবাগ পুণ্যতীর্থে পরিণত হবে।"

(৫) অমর সিংহ

উনবিংশ শতকে ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১—১৯৪০) একটি উপন্যাস রচনা করেন। নগেন্দ্রনাথ বহু উপন্যাস ও গল্পের লেখক এবং বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। নগেন্দ্র-নাথের জন্ম হয় বিহারের মোতিহারিতে, জীবনের বেশীর ভাগটাই তাঁর প্রবাসে কেটেছিল। মহাবিদ্রোহের অন্যতম নেতা এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা কুনওয়ার সিং বা কুমার সিং-এর সম্পর্কে বিহারে প্রচলিত কাহিনী তাঁকে 'অমর সিংহ' রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল বলে মনে হয়। 'অমর সিংহ' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খৃস্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর। নিছক রোমান্স লেখাই ছিল নগেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য, তবু সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাগুলিকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি এবং ঘটনার বর্ণনা করতে যেয়ে মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি যে সমস্ত মতামত প্রকাশ করেছেন মহাবিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাবের দিক থেকে তা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য।

'অমর সিংহ' পড়লেই বোঝা যায় যে, নগেন্দ্রনাথের মনে একটা দ্বিধা ছিল, মহাবিদ্রোহের চরিত্র সম্পর্কে তিনি একটা সুনিশ্চিত মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করেছেন কিন্তু পুরোপুরি সফলকাম হননি। কুনওয়ার সিং বা কুমার সিংহের মত বিদ্রোহী নেতাদের বীরত্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছে, আবার সিপাহীদের তিনি বর্বর ও অজ্ঞরূপেই দেখেছেন। তাঁর মতে মহাবিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে সিপাহীদের বিদ্রোহ বা মিউটিনি ছাড়া কিছুই নয়, আবার জনসাধারণ যে বিদ্রোহীদের সমর্থন করেছে এবং বিদ্রোহ যে গুরুতর আকার ধারণ করেছিল তাও তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। বিশ্বাসঘাতক ও পাষণ্ড রামশরণ দারোগার পরিণাম দেখাতে তাঁর ভুল হয়নি। লেখকের মতে সিপাহী বিদ্রোহ আদৌ সিপাহী যুদ্ধ নয়, বিদ্রোহ মাত্র অর্থাৎ মিউটিনি। সিপাহীদের ইংরাজরা বশীভূত রাখতে জানে না। "সিপাহী বিদ্রোহের মূলে

স্বদেশানুরাগ বা অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য দেখা যায় না। সিপাহীরা পিশাচের ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল, যুদ্ধধর্ম প্রতিপালন করে নাই।"

"দেশ ইংরাজের স্বপক্ষে ছিল, প্রবল প্রতাপান্বিত রাজগণ ইংরাজের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করে নাই। ···কোটি কোটি ভারতবাসী ইংরাজের জয় কামনা করিত।"

"যাহারা যুদ্ধ করে, তাহারা কেন যুদ্ধ করে তাহা জানে। সিপাহীরা তাহা জানিত না।···দিল্লীর বাদশাহের নামেই তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহারা জানিত না যে, মোগলের সৌভাগ্যসূর্য চিরকালের তরে অস্তমিত হইয়াছে।"

"যুদ্ধ যাহা হইয়াছিল, তাহা ইংরাজ ও ইংরাজের সিপাহীতে। সকল সিপাহীও ইংরাজের বিপক্ষ হয় নাই। শিখেরা ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধ না করিলে বিদ্রোহাগ্নি এত সহজে নির্বাপিত হইত না। এরূপ যুদ্ধকে বিদ্রোহ নামে অভিহিত করিতে হয়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদে সিপাহী বিদ্রোহের চরিত্রবিচার এই রকমভাবে করার সঙ্গে সঙ্গে লেখক বলেছেন: যেদিন ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধ হবে, সেইদিন ভারতবর্ষ থেকে ইংরাজের বাস উঠবে। লেখকের মতে ইংরাজ ভারতীয়দের মনোভাব জানে না, জানবার চেষ্টা করে না। তাদের এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে সিপাহীরা ইংরাজরাজ্য নাশের ষড়যন্ত্র চালিয়েছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের চরিত্র বিচারকালে লেখক শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বড় অংশের মনোভাব সঠিকভাবে ব্যক্ত করলেও তিনি বিদ্রোহকে ছোট করে দেখাতে চান নি।

কুমার সিংহকে উত্তেজিত করে জনৈক মৌলভী যখন তাঁকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে পারলেন তার আগে বিদ্রোহের অবস্থাটি লেখক সঠিক বর্ণনা করেছেন:

"জ্বালামুখী পর্বতের ক্রোড়ে যাহারা বাস করে, তাহারা যেমন কোন পূর্ব লক্ষণ জানিতে পায় না, ইংরাজ সেইরূপ কিছুই জানিতে

পারিল না, পর্বতের প্রকাণ্ড কটাহে যেমন তরল অগ্নি ফুটিতে থাকে, ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানা লোকের হৃদয়ে সেইরূপ তরলাগ্নি ফুটিতেছিল। ইংরাজের অজ্ঞাতে বিদ্যুৎশিখার ন্যায় বিদ্রোহের স্ফ লিঙ্গ চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। ইংরাজ ঘুমাইতেছিল, উঠিয়া দেখিল, গৃহের চতুর্দ্দিকে অগ্নি আসিয়াছে।

"নিঃশব্দে, অথচ বিদ্যুৎগতিতে বিদ্রোহের বীজ দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। ইংরাজ সৌভাগ্যশালী, সেইজন্য সেই বীজোদ্ভূত বৃক্ষশিশুতে জলসেচ করিবার কেহ ছিল না। যাহারা অগ্নি লাগাইয়াছিল, তাহারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্ত, কিন্তু অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিবার কেহ ছিল না। সেইজন্য সেই ভারতব্যাপী হুতাশন অত শীঘ্র নিভিয়া গেল, না হইলে ইংরাজ ভস্মীভূত হইয়া যাইত, তাহার চিহ্ন এদেশে হইতে লুপ্ত হইত।"

(ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

'অমর সিংহ' উপন্যাসে ৪১টি পরিচ্ছেদ এবং ছোট একটু পরিশিষ্ট আছে। মূল কাহিনীটি নিম্নরূপ: অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ফকির ফুল শাহের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বন্দ্বের চিত্র দিয়ে উপন্যাসের সূচনা করা হয়েছে। বাগানের ফুল তোলার অপরাধে সাহেব ফুল শাহকে ঘরে আটকালেন, কিন্তু তালাবন্ধ ঘর থেকে ফুল শাহ অন্তর্ধান হলেন। এর পরই কুমার সিংহের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কুমার সিংহ জাতিতে রাজপুত, আশী বছরের বৃদ্ধ। শাহাবাদ জেলার প্রধান জমিদার হিসাবে তাঁর বিপুল প্রতাপ। চিরকাল মুক্তহস্ত, ফলে ঋণগ্রস্ত। ইংরাজ সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর ঠিক হয় যে, বোর্ড অব রেভিনিউ তাঁর জমিদারী হাতে নেবেন এবং তিনি বিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে তাঁর ঋণ শোধ করে দেবেন। পরে জমিদারীর আয় থেকে আস্তে আস্তে এই টাকাটা শোধ করে দেওয়া হবে। কুমার সিংহ নিশ্চিন্ত হলেন। অকস্মাৎ বোর্ড অব রেভিনিউ জানালেন যে, এক মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা চাই, কিন্তু এক মাসের মধ্যে অত টাকা

সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। "ইংরাজের উপর তাঁহার যে অটল বিশ্বাস ছিল তাহা ঘুচিয়া গেল। তিনি মনে জানিলেন, ইংরাজ বাদ সাধিয়া তাঁহার সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।" এই সময় এক মৌলভীর প্রচারে প্রভাবিত হয়ে কুমার সিংহ বিদ্রোহে যোগ দেন। কুমার সিংহ নিঃসন্তান, ছোট ভাই অমর সিংহকে ছেলের মত দেখতেন। যুদ্ধবিদ্যায় তাকে পারদর্শী করেছিলেন—বিয়েও দিয়েছিলেন, কিন্তু সে সন্ন্যাস অবলম্বন করে।

ফকির ফুলশাহের নির্দেশে অমর সিংহ সন্ন্যাস-জীবন ত্যাগ করে ঘরে ফিরলেন এবং বড় ভাই কুমার সিংহের দক্ষিণ হস্তরূপে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। বাঁশুলিয়া বাবা নামে আর একজন অসীম ক্ষমতাশালী সাধুপুরুষও অমর সিংহকে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে গৃহস্থ ধর্ম অবলম্বন করার উপদেশ দেন, যদিও তিনি জানিয়ে দেন যে, যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ইংরাজই জয়ী হবে। এরপর গার্হস্থ্য জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে। অমর সিংহের স্ত্রীর নাম রাণী। অমর সিংহের আর এক ভাই ছিলেন সমর সিংহ। বিয়ের পরই তিনি মারা যান। তাঁর বিধবা পত্নী লছমী রাণীর সখী।

বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। আরায় ইংরাজদের শাসন লুপ্ত হল। দারোগা রামশরণ অশিক্ষিত, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ এবং ভীরু, কিন্তু কুবুদ্ধি তার বেশ। সে অবস্থা বুঝে কুমার সিংহের শরণাপন্ন হয়ে দারোগাগিরি বজায় রাখল আবার অন্তরে অন্তরে ইংরাজের জয় কামনা করতে লাগল। এক কথায় এই লোকটি হল 'অমর সিংহ' উপন্যাসের পাষণ্ড চরিত্র। আরার অবরুদ্ধ ইংরাজদের বাঁচাতে যেয়ে দানাপুরের ইংরাজ ও শিখ সৈন্যদের সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত ও বিধ্বস্ত হল।

"পলাইয়া ইংরাজ বাঁচিল না। সিপাহীরা অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে একে একে মারিতে লাগিল। কতক ইংরাজ পলায়ন করিয়া গ্রামে আশ্রয় লইল। গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে লাঠি দিয়া

ঠেঙ্গাইয়া মারিল। স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কালো হাড়ি ফেলিয়া মারিল।"

কুমার সিংহ এখন সর্বময় কর্তা। তাঁর বসতবাড়ী জগদীশপুরকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। এদিকে দারোগা রামশরণের কুদৃষ্টি অমর সিংহের পরমাসুন্দরী স্ত্রী রাণীর উপর অনেক আগেই পড়েছিল। মেজর আয়ারের সঙ্গে যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হলে দারোগা রামশরণ ইংরাজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরাজদের সাহায্য করতে লাগল এবং কৌশলে মিথ্যা খবর দিয়ে অমর সিংহের স্ত্রী ও লছমীকে আরায় নিয়ে যাবার নাম করে তাদের অপহরণ করল। বিবিগঞ্জের যুদ্ধ থেকে ফিরে অমর সিংহ এই খবর পেলেন। ইতিমধ্যে ফকির শাহ সংকটকালে আবির্ভূত হয়ে রাণী ও লছমীকে রক্ষা করলেন। মেজর আয়ার অসংখ্য মানুষকে ফাঁসী দিয়ে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করার পর জগদীশপুর আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করলেন। ইংরাজদের অত্যাচার দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীদের পিশাচবৃত্তির একটি ছবিও লেখক এঁকেছেন এবং সকল সিপাহীকেই নরপিশাচ বলে ঘোষণা করেছেন।

রামশরণকে পরে ইংরাজরা সন্দেহক্রমে বন্দী করে এবং তার স্ত্রী পিয়ারীর উপর গোরারা অত্যাচার করতে উদ্যত হয়। এই সময় আবার ফুল শাহের আবির্ভাবে পিয়ারী রক্ষা পায়। ফুল শাহ আরও কয়েকজন যুবতীকে গোরাদের কবলমুক্ত করেন। অমর সিংহও এই সময় একজন কামাতুর সিপাহীর হাত থেকে একজন ইংরাজ যুবতীকে বাঁচান। এই যুবতীর নাম লরা। লরাকে রক্ষা করতে যেয়ে অমর সিংহ বেশ আঘাত পেয়েছিলেন। অমর সিংহের শুশ্রূষার ভার লরার উপরেই পড়ে। বাঁশুলিয়া বাবার গোপন এক আশ্রয়স্থলে দুজনে কিছুকাল কাটান। লরা এই সময় অমর সিংহের প্রেমে পড়ে, কিন্তু অমর সিংহ বিবাহিত জেনে সে মুখ ফুটে আর কিছু বলেনি।

এদিকে কুমার সিংহের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ চলতে থাকে। রামশরণ ও তার স্ত্রী পালাতে গিয়ে অমর সিংহের সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে। পিয়ারীর আবেদনে রাণী রামশরণকে হত্যা করতে বারণ করেন। অমর সিংহ তার ললাটে কশা-চিহ্ন এঁকে দেন।

বালিয়ার কাছে শিবপুরে গঙ্গা পার হবার সময় কুমার সিংহের বাঁ হাত ইংরাজদের গুলীর আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তিনি নিজের হাতে সে হাত কেটে ফেলে দেন। ইতিমধ্যে রামশরণ আবার ইংরাজদের সঙ্গে যোগ দেন এবং তার কৌশলে অমর সিংহ বন্দী হন। লরা এই খবর পায় এবং ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রতারিত করে সে বন্দীগৃহের চাবি হস্তগত করে। লরার কৌশলে অমর সিংহ মুক্তি পান। বৃদ্ধ কুমার সিংহের আয়ু ফুরিয়ে আসছিল, তিনি অমর সিংহকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে দেহত্যাগ করলেন।

পাষণ্ড রামশরণ দুই পক্ষের সঙ্গেই যোগ রাখায় উভয় পক্ষেরই সন্দেহের পাত্র হয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকতা সে দু' দিকেই করেছে এই কথা বলে ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট তার ফাঁসীর হুকুম দিলেন। এবারও পিয়ারীর আকুল আবেদনে গোলযোগ সৃষ্টি করে ফুল শাহ তাকে বাঁচিয়ে দেন।

অমর সিংহ প্রাণপণ যুদ্ধ করেও আর ইংরাজদের প্রতিহত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত বাঁশুলিয়া বাবার নির্দেশে অমর সিংহ সপরিবারে নেপালে পালালেন। অমর সিংহের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য রামশরণ তাঁদের পিছু নিয়ে ছিল। অরণ্যের মধ্যে সে যখন গুপ্ত স্থান থেকে অমর সিংহকে গুলি করতে যাবে সেই মুহূর্তে লছমী তাকে দেখতে পেয়ে অমর সিংহ ও তার মাঝে ছুটে যায় এবং গুলির আঘাতে প্রাণ দেয়। তরুণী বিধবা লছমী যে অমর সিংহকে ভালবাসত তা তার শেষ সময় প্রকাশ পায়। অমর সিংহ ও রাণী নেপালে আশ্রয় পান। পাষণ্ড রামশরণ বার বার ব্যর্থকাম হয়ে ক্ষেপে ওঠে এবং কিছুদিন পরে ধরা পড়ে। আরায় তার ফাঁসী হয়। পিয়ারী ছাড়া আর তার জন্যে কাঁদার কেউ ছিল না। লরা আজীবন কুমারী থাকে, অমর সিংহ ছাড়া আর

কাউকে সে ভালবাসতে পারেনি। অমর সিংহের নেপাল যাত্রার পর প্রথমে ফুল শাহ ও পরে বাঁশুলিয়া বাবা নিরুদ্দেশ হন।

মহাবিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে আরও দু'টি উপন্যাস লেখা হয়েছিল। তান্তিয়া তোপীর বীরত্ব কাহিনী অবলম্বনে কালীপ্রসন্ন দত্ত 'বিজয়া' নামক উপন্যাস রচনা করেন। ডাঃ সুকুমার সেনের কাছে বইটির এক কপি ছিল, হারিয়ে গেছে। তাঁর নির্দেশমত কয়েকটি গ্রন্থাগারে উপন্যাসটির সন্ধান করেছিলাম, কোথাও পাইনি।

প্রিয়ম্বদা দেবীর মা (স্যার অশুতোষ চৌধুরীর দিদি) প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৩৯) লেখিকারূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত তাঁর 'অশোকা' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১২৯৬ সালে (১৮৯০ খৃস্টাব্দে)। এই বইটিরও কোন কপি খুঁজে পাইনি। মহাবিদ্রোহের বীর নায়ক নায়িকাদের সম্পর্কে প্রসন্নময়ী কি মনোভাব পোষণ করতেন তাঁর 'বীর নারী লক্ষ্মীবাঈ' কবিতাই তার প্রমাণ।

কবিতাটি প্রসন্নময়ীর 'বনলতা' কাব্যগ্রন্থে (১২৮৭ সালে প্রকাশিত ২৫টি খণ্ড কবিতার সংকলন) স্থান পেয়েছে।

কবিতাটির একটি স্তবক নিম্নরূপ :

"রণ বেশে মত্ত সতী নাচিছে সমরে রে
নাচিছে সমরে।
বিমুক্ত কুন্তল ভার,
মুখে শব্দ মার মার।
তীক্ষ্ণ তরবার ওই শোভিতেছে করে রে,
শোভিতেছে করে!
অতুলিত রূপ রাশি,
শরতের পৌর্ণমাসী।
রচি ছবি পরকাশি করিতেছে রণ রে,
করিতেছে রণ!

বঙ্কিমচন্দ্রও রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শাসকশক্তির রক্তচক্ষুর ভয়ে তিনি নিরস্ত হন।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন:

"এদেশে স্ত্রীরাই মানুষ, সে কথা আমি একবার বুঝাইবার চেষ্টা পেয়েছি। ইউরোপের যত মনস্বিনী স্ত্রীর কথাই বল, ঝান্সীর রাণীর চেয়ে কেহ উচ্চ নহে। রা[illegible]ত্রে অমন নায়িকা আর নাই। ইংরেজ সেনাপতি রাণীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া বলিয়াছিল, 'প্রাচ্যদিগের মধ্যে এই একমাত্র স্ত্রীলোক-পুরুষ।' আমার ইচ্ছা হয়, একবার সে চরিত্র চিত্র করি, কিন্তু এক 'আনন্দ মঠে'ই সাহেবেরা চটিয়াছে, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না।"

(বঙ্কিম প্রসঙ্গ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত, পৃঃ ১৯৭)

মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় বাংলা নাটক

নির্ব্বাপিত দীপ

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় উনিশ শতকে প্রথম এবং সম্ভবতঃ একমাত্র নাটক রচনা করেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২)।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র বহু গীতি নাট্য, নাটক ও সঙ্গীত রচয়িতা। এঁর 'নন্দবিদায়' নাটক এক সময় এমারেল্ড থিয়েটারে খুব প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসকে ইনি নাটকাকারে পরিবর্তিত করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

১২৬৪ সালের ৮ই অগ্রহায়ণ, কলিকাতার ঠনঠনিয়ায় অতুলকৃষ্ণের জন্ম হয়। অতুলকৃষ্ণ হুগলী জেলার কোন্নগর মন্দিরাবাটীর মিত্র বংশের রাজকৃষ্ণ মিত্রের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। অতুলকৃষ্ণের বয়স যখন দশমাস মাত্র তখনই ভারতীয় মহাবিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বালক বয়সে মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে নানা কাহিনী অতুলকৃষ্ণ নিশ্চয় শুনেছিলেন। মহাবিদ্রোহের সময় বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের একাংশের ইংরাজানুগত্য সম্ভবতঃ তাঁর বাল্যকালে তীব্রভাবেই সমালোচিত হয়েছিল। এর ফলে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের একাংশের দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে তাঁর মনে একটা ধারণা গড়ে ওঠে। তাঁর যৌবনকালে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের তথাকথিত স্বর্ণযুগে যখন বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মনোভাব গড়ে উঠছে তখনই তাঁর 'নির্ব্বাপিত-দীপ' নাটক প্রকাশিত হয়। ১৩১৮ সালের ১লা আশ্বিন ফড়িয়াপুকুরে অতুলকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। ১২৮৩ সালে (১৮৭৭ খৃষ্টঅব্দে) অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'নির্ব্বাপিত-দীপ' প্রকাশিত হয়। মূল নাটকটি মাত্র ৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। নাটকের

বিভিন্ন অঙ্কের গীতগুলি (মোট সংখ্যা ১২) পৃথক ছয় পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে।

প্রধানতঃ নানাসাহেব ও ঝাঁন্সীর রাণীর কাহিনী অবলম্বনে 'নির্ব্বাপিত-দীপ' রচিত, তবে কাল্পনিক চরিত্রের সংখ্যাই (বিশেষ করে বাঙালী চরিত্রের) বেশী। নাটকের মূল গল্পটি একেবারেই লেখকের কল্পনা প্রসূত, তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, কিন্তু খয়ের খাঁ শ্রেণীর বাঙ্গালীদের যে চরিত্র আঁকা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক নয়। নাটকে সকলেই 'আর্য্যসূত', মুসলমান চরিত্র একটিও নেই। লেখক ভারতীয় মহাবিদ্রোহকে দ্বিধাহীন চিত্তে ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, বাঙ্গালীর বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলেই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে। যে সময় অতুল কৃষ্ণ মিত্র তাঁর এই নাটক রচনা করেন সে সময় শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্য-বিত্তের মধ্যে জাতীয়তা-বোধের প্রথম জোয়ার এসেছে এবং 'খয়ের খাঁ' শ্রেণীর মানুষদের প্রতি তার ঘৃণা জেগে উঠেছে। 'নির্ব্বাপিত-দীপ'-এর জাতীয়তাবোধের এই অভিব্যক্তি পূর্ণ মাত্রায় পরিস্ফুট।

'নির্ব্বাপিত-দীপ' নাটকের ভাষা ও রচনারীতি ভাল নয়, কিন্তু তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের উপযোগী। নাটকের কাহিনী নিম্নরূপ : বিঠূরের নানা সাহেব এবং ঝাঁন্সীর মহারাণী ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে কৃত-সঙ্কল্প, কিন্তু ঝাঁন্সীর বাঙ্গালী সেনাপতি গোপাল এ ব্যাপারে উৎসাহী নন। তিনি ইংরেজের গুণগান করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছেন না দেখে নানা সাহেব পরোক্ষে তাঁকে ভীরু বলেন।

এর পর থেকেই গোপাল প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজতে থাকে। নানাসাহেবের অবিমৃষ্যকারিতায় একটা সুযোগ জুটেও যায়।

নানাসাহেবের সমর্থক এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বপ্রকার সাহায্যদানে ইচ্ছুক বাঙ্গালী নেতা রামলাল বসুর একমাত্র কন্যা রূপবতী কৃষ্ণভাবিনীকে নানা সাহেব অপহরণ করেন। কন্যাশোকাতুর পিতাকে গোপাল এক বেনামা পত্র লিখে জানায় যে, বিঠূরের নানাসাহেবই তাঁর

কন্যা অপহরণ করেছে। রামলাল পত্র লেখকের কথা ঠিক বিশ্বাস করতে না পারলেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে নানাসাহেবকে সাহায্যদানের সঙ্কল্প তাঁর অটুট থেকে যায়।

ইতিমধ্যে নানা সাহেবের পত্নী মহীকুমারী স্বয়ং স্বামীকে বুঝিয়ে কৃষ্ণভাবিনীকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করেন। গোপাল তার পত্রে কোন ফল হল না দেখে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং গোপনে কারারক্ষীকে ঘুষ দিয়ে কৃষ্ণভাবিনীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। যেদিন সে কৃষ্ণভাবিনীকে হত্যা করতে যায় সেইদিনই মহীকুমারী অর্দ্ধোন্মত্তা কৃষ্ণভাবিনীকে মুক্তির সংবাদ দিয়ে সুস্থ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি দেওয়া হবে এই কথা কৃষ্ণভাবিনীকে জানিয়ে মহীকুমারী ও তাঁর সখীরা প্রস্থান করার পরই শয়তান গোপাল মুক্ত কারাগৃহে প্রবেশ করে কৃষ্ণভাবিনীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। গোপাল কৃষ্ণভাবিনীর মৃতদেহ নিয়ে চলে যায় এবং নানা সাহেবের প্রিয় অনুচর চন্দ্র যেদিন রামলাল বাবুর কাছে টাকা আনতে যায় সেইদিনই সে একটি সিন্দুকে করে কন্যার মৃতদেহ রামলাল বাবুর কাছে পাঠায়। শোকোন্মত্ত রামলাল লর্ড ক্যানিং ও সেনাপতি হ্যাভলকের কাছে নানা সাহেবের সমস্ত পরিকল্পনা ফাঁস করে দেন। এর ফলে যুদ্ধে নানাসাহেবের পরাজয় ঘটে। নানাসাহেবের পলায়নকালে গোপাল তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। ঘটনাস্থলেই সে ধরা পড়ে এবং নানা সাহেবের ভাই মধু রাও-এর অস্ত্রাঘাতে নিহত হয়। মহীকুমারী স্বামীর চিতায় সহমরণে যান এবং তিন সখী ও মধু রাও সকলেই চিতার আগুনে আত্মাহুতি দেন। নানা সাহেবের সহকর্মী দেশপ্রেমিক বাঙ্গালী চন্দ্র বলেন :

"হায়রে! এতদিনের পর ভারতের গৌরবদীপ নির্বাপিত হ'ল !!
ভারতবাসীগণ চিরসন্তাপ সাগরে ভাসমান হ'ল !!"

এর পরই দৈববাণী হল :

শোন চন্দ্র সূর্য তারা শোন গ্রহগণ।
শোন স্বর্গ মর্ত্ত্যবাসি শোন ত্রিভুবন ॥

শোনরে বাঙ্গালি জাতি,
জ্বালালি বিষের বাতি ;
ডুবিল তোদেরই তরে স্বাধীন তপন।
নারীরক্তপাতে পুনঃ বঙ্গের পতন॥

'নির্ব্বাপিত দীপ' নাটকের দেশপ্রেমমূলক গীতিগুলি উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রণোন্মুখ সুসজ্জিত সৈন্যদলের সম্মুখে পতাকাহস্তে চন্দ্রকুমার তারস্বরে গাইছেন :

ভারতে আবার জ্বলিল অনল।
জাগিল আবার আর্য্যসূতদল,
আবার কাঁপিল ভূধর সকল,
ধরণী আবার কাঁপিল আজ।
পামর ইংরাজ ক'রেছিল মনে,
কেহ নাই বুঝি ভারত ভুবনে।
আসুক এখন দেখিতে এখানে
কি সেজেছে বীর ধরি বীর সাজ॥
করাল কৃপাণ করিয়ে ধারণ,
চল রণাঙ্গণে চল সৈন্যগণ,
দেখিব কেমন শ্বেত বীরগণ,
কি বলে ভারত শাসন করে।
আর্য্যসূত! কর অসি উন্মোচন,
কেড়ে লও পুনঃ স্বাধীনতা ধন,
কেড়ে লও পুন রাজসিংহাসন
নাচহ আবার আনন্দ ভরে॥
উচ্ছলিত হোক আজি অনন্ত সাগর,
ধরুক্ প্রচণ্ড মূর্ত্তি প্রচণ্ড ভাস্কর,
শত শত ইরম্মদ ফেলুক অম্বর,
দগ্ধ হক একেবারে ইংরাজ নিকর!

আরও দুইটি গানে শত্রু নিধনের আহ্বান জানানো হয়েছে :

(১) মোহনিদ্রা ত্যাজ জাগরে ভারতবাসী।
কত সহিবি আর, বহিবি সন্তাপরাশি।
বীর গরব ভরে, ভীম কৃপাণ করে ;
তেজ তপনরূপে, নাচ অরাতি নাশি।
ছাড় জীবন আশা, শত্রু শোণিততৃষা ;—
মিটাও মনের সাধে, অরি হৃদয় শোষি॥

(সিন্দুরা—হরি)

(২) রণমদে মাতরে এখন।
শত্রুগণে রণাঙ্গনে কর আবাহন।
নিষ্কোষিয়া তরবারি,
জয় জয় রব করি,
কম্পিত কর আজি ভারত ভুবন।
ভারত সমরাঙ্গনে
শ্বেতাঙ্গ যবনগণে ;
পাঠাওরে শমন ভবন॥

(পরজ-কাওয়ালি)

শেষাংশে দৈববাণীর পূর্বে ব্যর্থতার ক্রন্দন গীতি :

কি হ'লো হায় !
নিরাশ আশায় !!
কঠিন পাষাণ হৃদি, বিদারিয়ে যায় রে
শোক আঁখি জলে,
হৃদি ভেসে যায়।
ভারতের শেষ ফল, বুঝিরে ফলিল ;
অকালে প্রবল বায়ু,
ওই বহি যায় !!!

(ছায়ানট-আড়াঠেকা)

মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় ছোট গল্প

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে ছোট গল্পও উনিশ শতকে কিছু কিছু লেখা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত রচিত 'ভৈরবী' উল্লেখযোগ্য। নগেন্দ্রনাথ তাঁর 'অমর সিংহ' উপন্যাসে টিকিয়া শাহ নামক এক বিখ্যাত সাধুর চরিত্র এঁকেছেন। এই সাধুর মহাবিদ্রোহের কিছু আগের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী অবলম্বনে নগেন্দ্র নাথ 'টিকিয়া শাহ' নামেও একটি ছোট গল্প লেখেন। মহাবিদ্রোহের ঠিক আগে টিকিয়া শাহের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের আভাষ এই গল্পে দেওয়া হয়েছে।

সিপাহীদের প্রতি নগেন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না থাকলেও বিদ্রোহীর নায়কদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন। 'অমর সিংহ' উপন্যাসে এবং 'ভৈরবী' নামক ছোট গল্পে তার প্রমাণ রয়েছে।

'ভৈরবী' গল্পের সারাংশ নিম্নরূপ: রাণী চন্দ্রা মহাবিদ্রোহের অন্যতমা নায়িকারূপে আজমগড়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধ করেন। বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর ইংরাজরা আত্ম-গোপনকারী বিদ্রোহী নেতাদের ধরবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন। রাণী চন্দ্রা ভৈরবী বেশে আত্ম-গোপন করেন। কিন্তু অপরূপ রূপ-লাবণ্যই তাঁর কাল হয়ে দাঁড়ায়। বারাণসীতে উপস্থিত হলে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁর পিছনে লাগে, কিন্তু ত্রিশূলধারিণী তেজস্বিনী ভৈরবী তাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করেন। ইতিমধ্যে ইংরেজের চর মোমতাজ আলি রাণী চন্দ্রার সন্ধানে বারাণসীতে উপস্থিত হয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের সহায়তায় রাণী চন্দ্রার অনুসন্ধান করতে থাকে। ঘটনাচক্রে উল্লিখিত দুর্বৃত্তদের সঙ্গে তার আলাপ হয়। সে দুর্বৃত্তদের সাহায্যে ভৈরবী বেশধারিণী চন্দ্রাকে খুঁজে বের করে। মোমতাজ আলি রাণী চন্দ্রার

পিতার কর্মচারী ছিল এবং সেই সময় থেকেই সে সুন্দরী রাণী চন্দ্রাকে লাভ করার জন্যে ব্যাকুল। বামন হয়ে চাঁদ ধরার আশা করায় চন্দ্রা তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই মোমতাজ আলি প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করতে থাকে। বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে সে ইংরাজের গোয়েন্দারূপে রাণী চন্দ্রার সন্ধান করতে থাকে। রাণী চন্দ্রা ধরা পড়লে তাঁর মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে একথা মোমতাজ আলি জানত। ভৈরবী-বেশ-ধারিণী রাণী চন্দ্রাকে আসন্ন দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে তাঁকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে বাঁচাতে চায়। রাণী চন্দ্রা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় সে তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্যে সিপাইদের ডাকে। ইতিমধ্যে নিজের বুকে ত্রিশূল বিদ্ধকরে রাণী চন্দ্রা আত্মহত্যা করেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ প্রমুখ সেদিনের যুবকরা ঠনঠনিয়ার পোড়ো বাড়ীতে গুপ্ত 'সঞ্জীবনী সভা' স্থাপন করে যে সশস্ত্র বিদ্রোহের কল্পনার 'উত্তেজনার আগুন' পোহাতেন তার কতটা মাৎসিনি গারিবল্‌দী, আর কতটা বা ভারতীয় মহাবিদ্রোহের প্রভাবমিশ্রিত ছিল তা বলা কঠিন, তবে ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের রচনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে ঠাকুর বাড়ীতে ভারতীয় মহাবিদ্রোহের নায়কদের শ্রদ্ধার চোখেই দেখা হত। কিশোর রবীন্দ্রনাথের উপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব সুবিদিত।

১৮৭৭ খৃস্টাব্দে হিন্দু মেলার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত লর্ড লিটনের দিল্লী দরবার সংক্রান্ত কিশোর রবীন্দ্রনাথের কবিতাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বপ্নময়ী' নাটকে (১৮৮২) 'বৃটিশ' স্থলে 'মোগল' বসিয়ে কবিতাটিকে শাসক শক্তির রক্ত চক্ষুর আড়াল করে ফেলেন। ১৮৭৫ সালে রচিত এই কবিতাটি তখন আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

(রবীন্দ্র জীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড)

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫ সালের বৈশাখ মাসে 'দুরাশা' নামে তাঁর বিখ্যাত গল্পটি লেখেন। এই গল্পে মহাবিদ্রোহের কোন মূল্যায়নে কবি প্রবৃত্ত হননি, তিনি মহাবিদ্রোহকে নিছক পটভূমি রূপেই গ্রহণ করেছেন। এই গল্প সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যই ঠিক। তিনি লিখেছেন ঃ "যে ব্রাহ্মণের সদাচারদীপ্ত নৈষ্ঠিকতা মুসলমানী কুমারীর তরুণ হৃদয়কে একদা হরণ করিয়াছিল, তাহা কেশরলালের সত্যধর্ম ছিল না—তাহা ছিল তাহার সংস্কারগত অর্জিত আচারধর্ম। তাই সে বহিরাবাসের ন্যায় আচার-ধর্মকে ত্যাগ করিয়া সহজেই ভুটানী স্ত্রী ও ভুট্টাখেতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু নারী তাহার সর্বস্ব দান করিয়া আজ রিক্তা।" নবাব কুমারীর খেদোক্তিতে গল্পের শেষ কথা বলা হইয়াছে—

"হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।"

'দুরাশা' রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন কোচবিহারের মহারাণীকে শোনানোর জন্যে দার্জিলিং-এর রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে।

(রবীন্দ্রনাথ, পত্রধারা, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৯,
হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্র।)

এর মধ্যে ভারতীয় মহাবিদ্রোহের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরাগ আবিষ্কার করা নিতান্তই কষ্টকল্পনা।

'দুরাশা'র কাহিনী "ছবি নয়, ছবির ফ্রেম।" ছবির মর্ম বা মূল লেখকের হৃদয়ে ও সমকালে বর্তমান, কাজেই "ফ্রেমের মূল্যে ছবির মূল্য নিরূপণ করা উচিত হইবে না"—শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর এই মন্তব্যটুকুও (রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, পৃঃ ৩০) এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তবু এই ফ্রেমের মধ্যেও মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরূপতার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

বালক রবীন্দ্রনাথ 'ঝান্সীর রাণী' প্রবন্ধে মহাবিদ্রোহের বীর নায়ক-নায়িকাদের প্রতি যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, মনে হয় পরিণত বয়সেও তিনি সেই শ্রদ্ধা হারান নি। 'দুরাশা'য় বদ্রাওনের নবাবপুত্রীর মুখেও সেই শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। তাই নবাবপুত্রী বলেন :

"ক্রমে বৃটিশরাজ হিন্দুস্থানের বিদ্রোহবহ্নি পদতলে দলন করিয়া নিবাইয়া দিল। তখন সহসা কেশরলালের সংবাদ আর পাওয়া গেল না। ভীষণ প্রলয়ালোকের রক্তরশ্মিতে ভারতবর্ষের দূরদূরান্তর হইতে যে সকল বীরমূর্তি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া গেল।"

ইতিহাসের ইতিকথা

"আমরা মনে করি যে, সমসাময়িক লোকেরা ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ঘটনাকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন ইতিহাস তদপেক্ষা একেবারে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে সেই ঘটনাকে দেখবে। ভাবীকালের রায় কি হবার সম্ভাবনা আছে তা বিদেশী জাতিগুলির মতামত এবং ইংরাজদের মনোভাবে যে বিরাগ দেখা যাচ্ছে তা' থেকে কিছু পরিমাণে আগেই আন্দাজ করা যেতে পারে।"

(হরিশ্চন্দ্র মুখার্জীর রচনাবলী (ইং)—
দি হিন্দু পেট্রিয়ট, ৬ই মে, ১৮৫৮)

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের প্রথম বাংলা ইতিহাস

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ অবসানের কুড়ি বছর পরে বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় প্রথম মহাবিদ্রোহের ইতিহাস খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে শুরু করে। স্বনামখ্যাত রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) তাঁর যৌবন-কালেই জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিকের দৃষ্টিতে ভারতীয় মহাবিদ্রোহের বিচার করতে চেয়েছিলেন, 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' সেই প্রয়াসের ফল। বাঙ্গালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনের দ্বন্দ্ব তাঁর মনেও ছিল এবং সে দ্বন্দ্বের পরিচয় তাঁর ইতিহাসে সুপরিস্ফুট, কিন্তু ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ইতিহাস বাংলা ভাষায় এবং জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে প্রথম রচনা করে রজনীকান্ত বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন।

১৮৭৭ খৃস্টাব্দ থেকে রজনীকান্তের রচিত ইতিহাস খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকে এবং পরে পাঁচটি স্বতন্ত্র ভাগে সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রথম চার ভাগ রজনীকান্তের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ বা পঞ্চম ভাগ প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে ১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (ইং ১৯০০)। রজনীকান্ত দেশপ্রেমিক ছিলেন, তাঁর লেখা এক সময় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ তরুণদের মনে প্রবল উন্মাদনা ও প্রেরণা জাগিয়েছে। বিশ বছর ধরে বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে রজনীকান্ত জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে ভারতীয় মহাবিদ্রোহের বিস্তারিত ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ করেন। পাঁচ ভাগে সম্পূর্ণ এই বিরাট ইতিহাস-গ্রন্থ রজনীকান্তের স্মরণীয় কীর্তি। কিন্তু একটি কথা বিশেষ-ভাবে মনে রাখা দরকার যে রজনীকান্তকে সতর্ক-পদে অগ্রসর হতে

হয়েছিল। বিদ্রোহের কারণ, সিপাহীদের বীরত্ব, বিদ্রোহের নায়কদের শৌর্যবীর্য এবং ইংরাজ শাসকদের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার ইত্যাদির সঠিক ও বিস্তারিত বিবরণ দিলেও রজনীকান্ত অকপটে তাঁর মতামত সর্বত্র ব্যক্ত করতে পারেননি। দেশের লোকের বিশেষ করে বাঙ্গালীদের রাজানুগত্যের উচ্ছ্বসিত এবং আবেগপূর্ণ বর্ণনা তাঁকে দিতে হয়েছে এবং সমগ্র গ্রন্থের মূল সুরের সঙ্গে এটা এত বেমানান যে পাঠকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে, লেখক রজনীকান্ত কেন এমন স্ববিরোধী কথা বললেন।

রজনীকান্ত নিজেই এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ঃ

"...আমি কুড়ি বৎসরেরও অধিককাল হইল, এই ইতিহাস প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ঘটনাচক্রের বহুবিধ আবর্তনে আমার উদ্যম দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ ছিল। শেষে নানা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্বক সঙ্কল্প সাধনে পুনর্ব্বার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। আশানুরূপ উপকরণের অভাবে আমার সঙ্কল্পসিদ্ধির অন্তরায় ঘটিয়াছে। যাবতীয় উপকরণের সংগ্রহে এবং যথাস্থলে উহার বিনিয়োগে দেশকালের অনিবার্য্য গতিও আমার প্রতিকূল হইয়াছে। আমি এই প্রতিকূলতার নিরোধে সমর্থ হই নাই।"

—সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৪৫০।

বিপ্লব, মহাবিপ্লব প্রভৃতি শব্দ গ্রন্থের মধ্যে ব্যবহার করলেও রজনীকান্ত বই-এর নামে 'সিপাহী বিদ্রোহ' কথাটি পর্যন্ত ব্যবহার করেননি, নাম দিয়েছেন 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস।'

এগুলো নিতান্ত মামুলী ব্যাপার নয়। এতটা সতর্কতা অবলম্বনের ফল ফলেছিল। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' শুধু যে বাজেয়াপ্ত হয়নি তা' নয়, গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য গ্রন্থ বলে ১৯১২ সালের ২রা অক্টোবর সরকারী গেজেটে অনুমোদিতও হয়েছিল।

পঞ্চম ভাগের 'বিজ্ঞাপনে' রজনীকান্তের করুণ স্বীকারোক্তিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রজনীকান্ত লিখেছেন ঃ

"মহামতি কে. সাহেব প্রভৃতির ইতিহাস উপস্থিত গ্রন্থের অবলম্বন-স্বরূপ। ইংরেজ লেখকগণ যেমন আপনাদের জাতীয় ভাবে

আকৃষ্ট হইয়া সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়াছেন, উপস্থিত ইতিহাসে ইংরেজের সংগৃহীত উপাদানের প্রয়োগকালে আমিও সেইরূপ আমাদের জাতীয় ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি। আমি জানি যে, এ-বিষয়ে আমার প্রয়াস সর্ব্বাংশে সফল হয় নাই। বিপত্তিময় পিচ্ছিলপথে আমাকে অনেক স্থলে স্খলিতপদ হইতে হইয়াছে।"

[২]

রজনীকান্ত গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর রচিত সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের শেষ বা ৫ম ভাগ প্রকাশিত হয়। পূর্ণাঙ্গ এই ইতিহাসে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভূমিকা লেখার কথা ছিল। ভূমিকার পরিবর্তে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের পরবর্তী সংস্করণের প্রথম খণ্ডে ১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখা স্বর্গীয় 'রজনীকান্ত' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর রজনীকান্ত গুপ্তের একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করে লিখেছেন :

"সেই প্রবন্ধেরই শেষভাগে উল্লিখিত দেখিলাম, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় প্রচলিত ইতিহাসের ভ্রম খণ্ডন করিয়া সিপাহী যুদ্ধের বৃহৎ ইতিহাস লিখিবার সংকল্প করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হইবে; তাহাতে বৈদেশিকগণের ভ্রম প্রদর্শিত হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের নানা কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইবে। এই চিন্তায় আমার বালক হৃদয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিল।"

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের প্রথম সংস্করণ ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে থাকে। প্রথম খণ্ড রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে পড়লে তিনি সাগ্রহে সেইখণ্ড পড়ে ফেলেন। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন, "আগ্রহ সহকারে আমি সেই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ

করিলাম; একবার পড়িয়া তৃপ্তি হইল না। পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলাম……সত্যের প্রতি অনুরাগ, স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠে ব্যক্ত দেখিতে পাইলাম।"

রামেন্দ্রসুন্দর ১৩০৭ সালের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর 'স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত' প্রবন্ধে (এটিও রজনীকান্তের সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসের পরবর্তী সংস্করণের প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে) বলেন :

"স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক।" স্বজাতির প্রতি রজনীকান্তের আন্তরিক অনুরাগ তাঁকে সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই অনুরাগের উল্লেখ করে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন :

"ঐতিহাসিকের হস্তে স্বজাতির চরিত্রে অযথা কলঙ্ক লেপন দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেই কলঙ্ক প্রক্ষালনের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার জন্য তিনি এই কারণে সঙ্কল্প করেন।"

রামেন্দ্রসুন্দর স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন "বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে ইতিহাস আলোচনার পথ নিতান্ত সরল নহে। প্রথমতঃ ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।……

"দ্বিতীয়তঃ, তিনি (রজনীকান্ত) যে বিষয়ের আলোচনায় হাত দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ বর্তমান সময়ে দুঃসাহসের কাজ…… তিনি তাঁহার বন্ধুগণ কর্তৃক এবং তাঁহার পরিচিত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ কর্তৃক তাঁহার মনের আবেগ সংযত করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই।"

রজনীকান্ত গুপ্তের 'সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস' সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মন্তব্যগুলি একটু সবিস্তারে দেশবাসীকে মনে করিয়ে দেওয়ার

প্রয়োজন আছে। বাংলার অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে কি রকম ধারণা পোষণ করতেন তা নিশ্চয়ই জেনে রাখা দরকার।

[৩]

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে বিদ্রোহের পূর্বাহ্ণে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সিপাহী সৈন্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে প্রথম ভাগে গ্রন্থের সূচনায়।

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে (তৃতীয় সংস্করণে) চারটি অধ্যায়ে যুদ্ধের প্রারম্ভ বর্ণিত হয়েছে। নতুন রাইফেল ও টোটার প্রবর্তন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠার বিস্তারিত বিবরণ এই খণ্ডে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের উপসংহারে রজনীকান্ত দেশব্যাপী ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করে লিখেছেন :

"যদি সিপাহীরা একদিনে ভারতবর্ষের সর্বত্র ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ প্রায় সমস্ত ইঙ্গরেজই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। এরূপ অবস্থায় ভারতে পুনরায় আধিপত্য স্থাপন অবশ্য ইঙ্গরেজের দুঃসাধ্য হইত। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের আলোচনা করিলে আরও একটি বিষয় জানিতে পারা যায়। উত্তেজিত সিপাহীরা ইঙ্গরেজদিগের সহিত প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে ও ধারাবাহিকরূপে যুদ্ধ করে নাই। কোন কোন যুদ্ধে তাহারা অসাধারণ পরাক্রম দেখাইয়াছে, সাহস ও বীরত্বের যথোচিত পরিচয় দিয়াছে; কিন্তু তাহারা দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত একজন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এই সময় বহু বাঙ্গালী ছিলেন। ইংরাজানুগ্রহ-পুষ্ট বাঙ্গালীরা স্বভাবতঃই জনসাধারণ ও সিপাহীদের কু-নজরে পড়েছিলেন এবং অত্যাচারিতও হয়েছিলেন। অবশেষে মুঘল সম্রাটের সার্বভৌমত্ব ও আধিপত্য স্বীকার করার পর তাঁরা নিষ্কৃতি পান। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে এবং একজন ধনী হিন্দুস্থানীর সাহায্যে সশস্ত্র সৈনিকদল গঠিত করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতেও তাঁরা কাল বিলম্ব করেননি। —(পৃঃ ৯৮, ৩য় খণ্ড)

এলাহাবাদে এই সময় একজন বাঙ্গালী মুনসেফ সৈন্যদল গঠন করে ইংরাজদের পক্ষ হয়ে সবিক্রমে লড়েন। ইনি হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার লোক। সিপাহীদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য এঁর নাম হয় "যুদ্ধবীর মুনসেফ।" 'ক্যালকাটা রিভিউতে' (৩১শ ভলিউম, পৃঃ ৬৯) এই মুনসেফের উল্লেখ করে লেখা হয়ঃ

"তিনি কেবল সাহস সহকারে আপনাদের অধ্যুষিত স্থান রক্ষা করেন নাই, অধিকন্তু আক্রমণের প্রণালী অবধারিত করিয়াছেন, পল্লীসমূহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন, ইংরেজীতে ঘটনার বিবরণ সহ অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া অধীন ব্যক্তিদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন এবং শাসন কার্য্যে ক্ষমতা ও আপনাদের প্রসিদ্ধ জাতীয় গুণ, বুদ্ধি প্রাখর্য্য দেখাইয়াছেন।"

রজনীকান্ত এই উদ্ধৃতি দিয়ে মন্তব্য করেছেনঃ

"সিপাহী যুদ্ধের সময় এই প্রদেশের (উত্তর-পশ্চিম) কোন স্থলেই ইহাদের (বাঙ্গালীদের) বিপক্ষতাচরণের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয় না। ইহারা সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের চিরন্তন রাজভক্তির সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।" —(পৃঃ ১১৫, ৩য় খণ্ড)

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের নেতারা প্রচারকার্যে যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তা প্রায় আধুনিক রাষ্ট্রগুলির প্রচার ব্যবস্থার সমতুল্য। নানা সাহেবের ঘোষণা ও আদেশপত্রগুলি এই প্রচারকার্যের নিদর্শন। নানা নারায়ণ রাও ইংরাজ সেনাপতি নীলের হাতে উল্লিখিত ঘোষণা

ও আদেশ-পত্রগুলি সমর্পণ করেন। কে সাহেবের রচিত ইতিহাসে পত্রগুলি প্রকাশিত হয়। এই রকম ১০টি ঘোষণা ও আদেশপত্রের সংক্ষিপ্তসার সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের ৩য় খণ্ডের পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। এগুলির প্রথমটি অর্থাৎ ৬ই জুলাই তারিখে পেশোয়ার রঞ্জিতোদ্যান থেকে প্রকাশিত বলে প্রচারিত ঘোষণাপত্রটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে, ইংরাজরা হিন্দুস্তানীদের ধর্মনাশ করে তাদের খৃস্টান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং এই উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড থেকে ৩৫ হাজার সৈন্য পাঠানো হয়, কিন্তু তুরস্কের সুলতানের ফর্মান পেয়ে মিশরের অধিপতি ভারতবর্ষের পথে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে সৈন্য সন্নিবেশ করেন এবং গোলাবর্ষণ করে ইংরাজদের সমস্ত জাহাজ ডুবিয়ে দেন। একজনও পালাতে পারেনি। এই ঘোষণাপত্রের শেষে যে কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে রজনীকান্ত তার নিম্নলিখিতরূপ অনুবাদ করেছেন ঃ

> "রজনী প্রারম্ভে সেই ছিল অতিশয়
> শক্তিমান্ ধনবান্ প্রভু সর্ব্বময়।
> প্রভাতে হইল তার শিরোহীন দেহ,
> মস্তকে মুকুট তার না দেখিল কেহ।
> তপনের আবর্ত্তনে মাত্র একবার,
> নাদির শা না রহিল কোন চিহ্ন তার।"

১৮৭৯ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রকাশিত উপেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত 'নানা সাহেব' উপন্যাসে এই ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতেই ইজিপ্টাধিপতি কর্তৃক বৃটিশ রণতরীসমূহ ডুবিয়ে দেবার কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

সিপাহীযুদ্ধের চতুর্থ ভাগে চারিটি অধ্যায় আছে। চতুর্থ অধ্যায়টি আবার তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পাঞ্জাব, দিল্লী এবং পেশোয়ারের ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই অধ্যায়ে কলকাতায় ইংরাজদের নিদারুণ আতঙ্ক, বিহারে কুনওয়ার বা কুমার সিংহ ও অমর সিংহের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

এই খণ্ডে রজনীকান্ত ভারতীয়দের, বিশেষ করে বাঙ্গালীদের রাজ-ভক্তি, ইংরাজদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও অবিবেচনা এবং লর্ড ক্যানিং-এর মহানুভবতার উপর জোর দিয়েছেন। বাংলার রাজা-মহারাজা, তালুকদার, বণিক প্রভৃতি রাজানুগত্য জানিয়ে সরকারের কাছে যে দু'টি পত্র পাঠিয়েছিলেন ইংরাজ সরকারের জবাবসহ সেই পত্র দু'টি এই খণ্ডের পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে। "বাংলা দেশের অধিবাসীদের পক্ষ" থেকে পত্র দিয়েছিলেন বর্ধমানের মহারাজা মহতাব চাঁদ বাহাদুর, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, নদীয়ার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায়, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখার্জী প্রভৃতি।

'সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে'র পঞ্চম বা শেষ ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। মৃত্যুর কিছুকাল আগে রজনীকান্ত ভূমিকায় লিখেছেন, "সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস পরিসমাপ্ত হইল। এতদিন পরে সাহিত্যক্ষেত্রে সহৃদয় পাঠকের সমক্ষে আমি একটি গুরুতর বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলাম।" (কলিকাতা, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ সাল)

পঞ্চম ভাগ সুবৃহৎ। এই ভাগে তিনটি খণ্ড এবং মোট ১৬টি অধ্যায় আছে। তাতিয়া তোপী ও ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর সংগ্রাম এবং মহাবিদ্রোহের অবসান পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ এই ভাগে দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্টে যোগ করা হয়েছে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্র এবং শ্রীমন্ত দামোদর রাও-এর নিকট লিখিত আগ্রা প্রবাসী মার্টিন সাহেবের চিঠি।

সিপাহী বিদ্রোহ বা মিউটিনী

রজনীকান্ত গুপ্তের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' রচনা যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন 'বসুমতী' কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে (তখন 'বসুমতী' কার্যালয় ছিল ১১৫।৪ গ্রে ষ্ট্রীটে) সিপাহী বিদ্রোহের একটি বৃহৎ ইতিহাস ১৩১৪ সালের ৫ই আশ্বিন প্রকাশিত হয়। এই ইতিহাস রচনা করেন ভুবন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯৪৬), 'লণ্ডন রহস্যে'র লেখক ('মিসট্রিজ অব দি কোর্ট অব লণ্ডন' নামক বিরাট গ্রন্থের অনুবাদক) রূপেই যিনি আমাদের কাছে সমধিক পরিচিত। সিপাহী বিদ্রোহের এই প্রথম বিস্তারিত বাংলা ইতিহাস-গ্রন্থের নাম হল 'সিপাহী বিদ্রোহ বা মিউটিনী।' ৩৬টি কাণ্ড বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থ ৫৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। দামের উল্লেখ নেই।

সিপাহী বিদ্রোহ বলতে প্রকাশক বা লেখক কি বুঝেছিলেন তা গ্রন্থের নামেই প্রকাশ। বিদ্রোহে জনসাধারণের অংশ গ্রহণের কোন বিবরণ এ গ্রন্থে নেই। নিছক সিপাহীদের বিদ্রোহ ও যুদ্ধের বর্ণনা এতে স্থান পেয়েছে। ইংরেজ রাজশক্তির রক্ত চক্ষু এড়িয়ে সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা এবং প্রকাশ করতে পারলে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বই-এর কাটতি হবে এবং বিপদেও পড়তে হবে না হয়ত এইরকম চিন্তাভাবনা প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মাথায় ছিল। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গীও হয়ত ঐ রকমই ছিল।

তবু তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী বইটি লেখা হয় বলে তাঁর মতামত জানা দরকার।

'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'অবতরণিকা'য় লিখেছেন—

"অৰ্দ্ধ শতাব্দী পূৰ্ব্বে ভারতবর্ষে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া সমগ্র ভারতে মহান অনর্থ ঘটাইয়াছিল।

"...রাজায় রাজায় অথবা সমানে সমানে যুদ্ধ এক প্রকার, প্রজারা বা চাকরেরা বিদ্রোহী হইয়া রাজা অথবা প্রভুগণের সহিত যে যুদ্ধের অবতারণা করে, তাহার প্রকৃতি অন্যপ্রকার। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ শেষোক্ত প্রকারের দৃষ্টান্ত। এইরূপ যুদ্ধেই অধিক অনর্থ।" ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী উল্লিখিত মন্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে তা লক্ষ্য করার মত।

উপেন্দ্রনাথের মতে লর্ড ড্যালহাউসির পররাজ্যগ্রাস নীতি, হিন্দু-মুসলমানের জাতিধর্ম নাশ হবার আশঙ্কা এবং কুচক্রীদের মিথ্যা প্রচার এই তিনটি কারণেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য যে ইংরাজ শাসকদের বিপদের কারণ হয়েছিল এ বিষয়টি উপেন্দ্রনাথ সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "হিন্দু-মুসলমানে চিরবিদ্বেষ, কিন্তু এই বিদ্রোহে উভয় শ্রেণী এক-মতাবলম্বী হইয়া ভারতের শ্বেত পুরুষগণের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল; তাহাই অধিক বিপত্তির কারণ।"

দেশের আবহাওয়া যে সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা করার অনুকূল এটা বুঝতে পেরে উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "বঙ্গবাসী পাঠক মহোদয়গণ! যদি দেশের কথা জানিতে চাহেন, দেশের ইতিহাস আলোচনা করিতে যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে, ইংরাজ রাজ্যের রাজনৈতিক জটিল রহস্য বঙ্গীয় সরল ভাষায় পাঠ করিতে যদি অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে সিপাহী বিদ্রোহের এই লোমহর্ষণ ও শান্তিপ্রদ ইতিহাস পাঠ করুন; এই ইতিহাস পাঠ করা আপনাদের অবশ্য কৰ্ত্তব্য।

"বিদ্রোহের সূত্র, বিদ্রোহের সংগ্রাম, বিদ্রোহের পরিণাম ও বিদ্রোহের শান্তি পর্য্যায়ক্রমে স্তবকে স্তবকে মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে বিস্তর শিক্ষালাভ হইবে সন্দেহ নাই।"

এখন লেখক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর একটু পরিচয় দিই।

ভুবনচন্দ্র তাঁর যুগের একজন জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। লেখা ছিল তাঁর পেশা। ভুবনচন্দ্র ছিলেন মাইকেল মধুসূদনের বন্ধু এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রিয়পাত্র। 'পরিদর্শক'-এর অন্যতম সম্পাদক জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের সহকারীরূপে ভুবনচন্দ্র সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেন। পরে 'বসুমতী'র (তখন সাপ্তাহিক) সম্পাদক হন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'বসুমতী'র সম্পাদক ভুবনচন্দ্র বসুমতীর গ্রন্থ প্রকাশন বিভাগে যোগ দেন। সেকালে ভুবনচন্দ্রের লেখা বেচে যাঁরা পয়সা করেছিলেন তাঁরা ভুবনচন্দ্রের শেষ বয়সে কিছুমাত্র সাহায্য করেননি।

বহু গ্রন্থের লেখক হয়েও (এবং সে সময় ভুবনচন্দ্রের লেখা বই-এর কাটতিও ছিল বেশি) দারিদ্র্যের মধ্যেই ভুবনচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই নিয়ে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশকদের প্রতি ইঙ্গিত করে তীব্র ভাষায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

লেখক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশক উপেন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুযায়ী বই লিখেছেন, কাজেই বইতেও উপেন্দ্রনাথ বর্ণিত কারণ-গুলিকেই বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। তবে ভুবনচন্দ্র (নিশ্চয়ই প্রকাশকের সম্মতিক্রমে) স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হননি। ভুবনচন্দ্রের মতে গবর্নর জেনারেল লর্ড ডালহাউসির পররাজ্য গ্রাস নীতি সাধারণ অসন্তোষের প্রধান কারণ। সেনাদল থেকে সুযোগ্য অফিসারদের স্থানান্তর করে অন্যান্য সরকারী কাজে নিযুক্ত করায় সরকারী বিভাগের বল ক্ষয় হল দ্বিতীয় কারণ। নূতন এনফিল্ড রাইফেল প্রবর্তন করার কথা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানো টোটা ব্যবহারের কথা প্রচারিত হওয়ায় অশান্তির সূত্রপাত। সিপাহী বিদ্রোহের এই হল তৃতীয় কারণ।

১৮৫০ খৃস্টাব্দে দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টের ঘটনার বিবরণ দিয়ে ভুবনচন্দ্র বিদ্রোহের ইতিহাস শুরু করেছেন। চর্বি-টোটা ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই জাত ধর্ম নষ্ট হবে এই আতঙ্ক সমস্ত সিপাহীকেও উত্তেজিত

করে তুলেছিল। দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টে একজন ব্রাহ্মণ সিপাহী নীচ জাতীয় একজন লস্কর তার লোটার জল খেতে চাইলে আপত্তি জানায়। তখন সেই লস্কর বলে যে, ইংরেজ রাজত্বে জাতিধর্মের ভেদাভেদ থাকবে না; গরু আর শুয়োরের চর্বিতে তৈরী টোটা সবাইকেই দাঁত দিয়ে কাটতে হবে। এই ভাবেই চর্বি-টোটার খবর ছড়িয়ে পড়ে। "কলিকাতার ধর্মসভা তাহা শ্রবণ করিয়া মহা উদ্বিগ্ন হইলেন।...দাবানলে বন দগ্ধ হয়, তাহা সকলেই দর্শন করে। কিন্তু অন্তরানলে অন্তর দগ্ধ হয়, তাহা কেহই দেখিতে পায় না, অথচ সে অনল শীঘ্র নির্বাপিত হওয়া সহজ নহে।" (পৃঃ ৩)

ব্যারাকপুরের সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষের আগুন কি করে জ্বলে উঠল তার বিবরণ দেবার পর কি ভাবে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলতে থাকল তার বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভুবনচন্দ্র লিখেছেন ঃ

"ইতিমধ্যে ব্যারাকপুরের টেলিগ্রাফ অফিসে অগ্নি দিয়া ভস্মসাৎ করা হইয়াছে। তদবধি প্রতি রজনীতেই অগ্নিকাণ্ড হইতেছে। অফিসারগণের বাঙলোর খড়ের চালে চালে অগ্নি জ্বলিতেছে, কতকগুলি সরকারী বাড়ীতে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। কেবল ব্যারাকপুরেই এইরূপ কাণ্ড, তাহা নহে, একশত মাইল দূরবর্তী রাণীগঞ্জেও ঘন ঘন গৃহদাহ হইতেছে। অনুমান এইরূপ যে, ২য় গ্রিনেডিয়ার দল ইতিপূর্বে সাঁওতাল পরগণায় অবস্থান করিয়াছিল। সাঁওতালরা কুপিত হইলে বিপক্ষ পক্ষের ঘর জ্বালাইয়া দেয়, সেই রঙ্গ দেখিয়াই সিপাহীরা সাঁওতালের অনুকরণে অগ্নিকাণ্ড করিতে শিখিয়াছে।" (পৃঃ ৬)

ব্যারাকপুর, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের বিদ্রোহের বিবরণ দেবার পর তৃতীয়কাণ্ডে নানাসাহেবের বিবরণদানপ্রসঙ্গে ভুবনচন্দ্র 'চপাটী'র গল্প বলেছেন। তিনি লিখেছেন যে, রুটির ভিতরে চিঠি থাকত, কি লেখা থাকত তা সকলে জানত না, তবে "জনরবে প্রকাশ, পাঁচকড়ি খাঁর প্রণীত 'একজন আরদালীর গুহ্য কাহিনী' নাম্নী পুস্তিকা হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছিল।" (পৃঃ ৫১) ভুবনচন্দ্র তাঁহার দীর্ঘ

ইতিহাসে বিদ্রোহের বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে ইংরাজদের গুণগান এবং সিপাহীদের নৃশংসতার বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজরা যে বীভৎস অত্যাচার চালিয়েছিল তার বর্ণনা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। তিনি শ্লেষ করে লিখেছেন :

"অসভ্য বর্ব্বর বিদ্রোহী সিপাহীরাই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ইউরোপীয় নরনারী হত্যা করিয়াছিল। ইংরাজেরা ক্ষমাগুণে স্থির হইয়া সহ্য করিয়াছিলেন, স্থল বিশেষে অপরাধীগণকে সাজা দিয়াছিলেন, আর কিছুই করেন নাই। এবিষয়ের প্রতিভূ কে হইবেন? বিদ্রোহের ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, মধ্য অবসরে প্রতিফল দিবার সঙ্কল্পে অনেক ইংরাজ-পুরুষ দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন। নগরে-উপনগরে, জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, ভীষণ—ভীষণ—অতি ভীষণ মহামারী সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। দেশীয় লোকদিগকে—স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই (আবালবৃদ্ধ-বনিতাগণকে) প্রতিফল দিবার ব্যাপদেশে নির্দ্দয়রূপে খুন করা হইয়াছিল, নিষ্ঠুর লোকের নিষ্ঠুর আদেশে নিরীহ লোকদিগের গৃহে গৃহে অগ্নি লাগাইয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, রুগ্ন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগুলিকে পর্য্যন্ত জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করা হইয়াছিল! দয়াময় ভগবানের রাজ্যে ইহারই নাম কি বৈরনির্য্যাতন? ইংরাজের ইতিহাসেই প্রকাশ, ক্রমাগত তিনমাসকাল প্রতিদিন আট আট খানা গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া বাজারে বাজারে ও রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করাইয়া ভাগাড়ে ভাগাড়ে ও নদীতে নদীতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল!" (পৃঃ ২৪২)

এখানে ভুবনচন্দ্র নিজের তীব্র বিক্ষোভ ও উত্তেজনা চেপে রাখতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন :

"কয়েকটি ইংরাজ বিবির প্রাণ বিনাশে ইংরেজের রক্ত গরম হইয়াছিল, বৈর নির্যাতনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাঁহারা রক্তপ্লাবন উপস্থিত করিয়াছিলেন, সাফাই দিবার জন্য তাঁহারা তৎকালে বলিয়াছিলেন, ধর্ম্মানুসারে সুবিচারে প্রতিফল দেওয়া হইয়াছিল। যাঁহাদের শরীরে

মানব শোনিত প্রবাহিত, যথার্থ মনুষ্যত্ব যাঁহাদের ভূষণ তাঁহারা ঘৃণাপূর্ব্বক ঐরূপ উক্তি অগ্রাহ্য করিবেন।" (পৃঃ ২৪০)

বিংশ কাণ্ডে কলকাতার ইংরেজ মহলে বিদ্রোহের ফলে কিরকম আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল তার কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরে বিহারে কুমার সিংহের বিদ্রোহী দলে যোগদান এবং তাঁর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। জলপাইগুড়িতে শুধু আতঙ্কবশতঃ ইংরেজরা কিভাবে কয়েকজন সিপাহীকে অকারণে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তাও ভুবনচন্দ্র দেখিয়েছেন। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

"ইংরেজেরা যাহাই বলুন, রাণীর প্রতি যৎপরোনাস্তি অবিচার হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি মর্ম্মাহত হইয়া বিদ্রোহীদলের সহায়ক হইয়াছিলেন। দেশস্থ লোকেরা চিরদিন তাঁহাকে স্মরণ করিবেন, সকলেই বলিবেন, স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া রাণী আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন।" (পৃঃ ৫২৬) তাঁতীয়া তোপীকেও ভুবনচন্দ্র 'বীর' বলে অভিহিত করেছেন। গ্রন্থের ষষ্ঠত্রিংশৎ কাণ্ডে অর্থাৎ শেষ অধ্যায়ে রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের অনুবাদ দিয়ে সকলে তাঁর "জয়-মঙ্গল-কীর্ত্তন করিয়াছেন" বলে গ্রন্থ শেষ করা হয়েছে।

সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস

সাংবাদিকদের খ্যাতি সাংবাদিকদের জীবনকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি বাঙালীর মন থেকে একেবারে মুছে যায় নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক তাঁর রচনাবলীর দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। হয়ত আরও দু'এক খণ্ড হবে, তবে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) তার মধ্যে স্থান পাবে কিনা বলা শক্ত। কারণ, সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে শ্রীসজনীকান্ত দাসের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সুপরিচিত। তবু কোনো বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য যদি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই মূল্যবান ইতিহাস তাঁর রচনাবলীর মধ্যে স্থান না পায় তা হলে সেটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হবে একথা বলা বাহুল্য।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে কর্মজীবনে তিনি ছিলেন শিক্ষক পরে 'বঙ্গবাসী'তে তাঁর সাংবাদিকতার হাতে খড়ি হয়। 'বঙ্গবাসী' ছিল কংগ্রেস-বিরোধী। ১৮৯৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস সমর্থক 'বসুমতী'তে যোগ দেন। বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য, হিন্দুধর্ম ইত্যাদির প্রতি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র আবেগ ও আকর্ষণের মূলে ছিল তাঁর তীব্র জাতীয়তাবোধ। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা'য় লিখতেন। 'হিতবাদী' 'নায়ক' ইত্যাদি সম্পাদনার কাজ তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেন। ১৯২৩ সালের (বাং ১৩৩০) ১৫ই নভেম্বর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

প্রাচীন ও সনাতন ভারতবর্ষের প্রতি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল অসাধারণ মমতা এবং সেই কারণেই তাঁর মতাদর্শ ছিল রক্ষণশীল।

কিন্তু ভারতে ইংরেজাধিকারের মূল বৈশিষ্ট্য তিনি সঠিকভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। 'গোড়ার কথা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

"...সভ্যতা, জ্ঞান, বিদ্যা লইয়া মুসলমানের সহিত হিন্দুর তেমন আড়াআড়ি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না।

"...সভ্যতার হিসাবে হিন্দুকে কখনই ছোট বলিয়া মোগল পাঠান ভাবে নাই।

"ইংরেজের আমলে ঘোর পরিবর্তন হইয়াছে। সায়েন্স বা পদার্থ-তত্ত্বের চর্চায়। সংহাত-শক্তির বিকাশে অন্য মানবোচিত গুণে ইংরেজ আমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।" (রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃঃ ২১২)

ইংরেজের এই শ্রেষ্ঠত্ব তার আধিপত্য বিস্তারের কারণ বলে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মেনে নিয়েছেন, তাই সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে তিনি অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠেছেন। সিপাহীদের পরাজয় অনিবার্য, কারণ "যাহা হইবার নহে তাহা হইতে নাই বলিয়াই হয় নাই।" কার্ল মার্কস-এর মত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও মনে করেন যে "যাদের খাইয়ে পরিয়ে পিঠ চাপড়িয়ে মোটা করে মাথায় করে রাখা হয়েছিল সেই সিপাহীরাই" বিদ্রোহ শুরু করেছিল। তার কারণও তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে সিপাহীরা যে শেষ পর্যন্ত হারবে এ ত জানা কথা, কাজেই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসকে "বিয়োগান্ত নাটক" বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু "দেশ কাল ও পাত্র সিপাহী যুদ্ধের অনুকূল" ছিল কাজেই বিদ্রোহ হওয়া ছিল অনিবার্য—এইভাবেই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাবিদ্রোহকে দেখেছেন।

ইংরেজানুগ্রহে শিক্ষিত বাঙালীরা উচ্চপদ পেয়েছিলেন। তাঁরাই ছিলেন ইংরেজদের 'একমাত্র অবলম্বন।' তাঁরা পাঞ্জাবে ও পশ্চিমোত্তর ভারতে যে আচরণ করেছিলেন তার সম্পর্কে তীব্র ভাষায় মন্তব্য করতে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিধা করেন নি। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড) ১৩১৬ সালে 'হিতবাদী'র পরিচালকদের উদ্যোগে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। রাসেল,

কে-ই ম্যালেসন, ফরবেস-মিচেল, মার্টিন, টেইলর, লর্ড রবার্ট, স্যার জন হোপ গ্র্যান্ট প্রমুখ ১৩ জন ইংরাজ লেখকের গ্রন্থ এবং রুলার্স অব ইণ্ডিয়া সিরিজের ৫ খানি বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। এছাড়া হিন্দী ভাষায় লিখিত লিথোয় ছাপা 'সাস্তাওন কা গদর' প্রভৃতি অনেক পুস্তিকাও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করেছিলেন।

ভূমিকায় তিনি লেখেন, "যাহাতে ঐতিহাসিক সত্য অক্ষুণ্ণ থাকে, উভয় পক্ষের সত্য ঘটনা সকল যাহাতে লোকলোচনের গোচর হয় সে পক্ষে আমি চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই, করিবও না। পক্ষপাতবর্জ্জিত হইয়া সত্য ঘটনার ও সত্য সিদ্ধান্তের প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য।"

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সত্য সন্ধানের চেষ্টা ইংরেজ সরকার সুনজরে দেখেননি, ফলে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। দেড় হাজার পৃষ্ঠায় তিন খণ্ডে ইতিহাস সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হয়নি। রজনীকান্তের পর বাংলা ভাষায় এই রকম বিস্তৃতভাবে মহাবিদ্রোহের ইতিহাস রচনার চেষ্টা আর কেউ করেননি। প্রথম খণ্ডে দীর্ঘ ও মূল্যবান মুখবন্ধ ছাড়া চৌদ্দটি পরিচ্ছেদ আছে, ২৫৩ পৃষ্ঠায় গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডের আবার দুটি ভাগ আছে। উপক্রমণিকায় সিপাহীদের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে বিদ্রোহের হেতু নির্ণয় এবং যুদ্ধারম্ভ ভাগে বিদ্রোহের প্রসার ও দিল্লীর পতন পর্যন্ত অর্থাৎ সিপাহীদের উত্থান এবং পতনের সূচনার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মুখবন্ধে লেখক সিপাহীরা কেন বিদ্রোহী হল এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন মুঘল আমলে সিপাহী শব্দের তেমন প্রচলন ছিল না। মহাজন, ছোট জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতির রক্ষকের কাজ যারা করত তাদেরই সিপাহী বলা হত। পরে ফরাসী ও ইংরাজ ব্যবসায়ীদের আড়ত কারখানার বেতনভোগী রক্ষীদের সিপাহী নাম দেওয়া হয় এবং ইউরোপীয় [illegible] অধীনে এরাই প্রথম আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায়

শিক্ষিত হয়ে দুর্জয় হয়ে ওঠে। ফরাসী শাসক মঃ ডুমাই (M Beniot Dumas) সর্বপ্রথম 'তেলেঙ্গা সিপাহী'র সৃষ্টি করেছিলেন। প্রকৃত-পক্ষে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ছোট ছোট মুসলমান নবাবদের উপদ্রবে অতিষ্ঠ দেশবাসী স্বেচ্ছায় আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন্য উৎসুক হয়। ডুমার পত্রে জানা যায় যে দক্ষিণের তেলেঙ্গাগণ ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে যুদ্ধবিদ্যালাভের জন্য উপযাচকরূপে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল।

আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত সিপাহীদের আর্থিক দিক থেকে খুব সুবিধা হয় এবং সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক রেজিমেণ্টের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল, নতুন দেশ জয় করতে সিপাহীরা দ্বিগুণ ভাতা পেত। এ ছাড়া লুটের ভাগও পেত। কার্ল মার্কস এই কারণেই বোধ হয় 'Pampered Sepoys' কথাটা ব্যবহার করেছেন। সাগরপারে সিপাহীদের কখনও নিয়ে যাওয়া হবে না এবং তাদের জাতিধর্ম রক্ষা করা হবে বলে ইংরাজরা প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। অযোধ্যায় সিপাহীরা বিশেষ অধিকার ভোগ করত। ইংরাজদূতের মারফত লখনৌ-এর দরবারে সিপাহীরা তাদের দরখাস্ত পাঠাত। এই থেকে অযোধ্যায় "সিপাহীকা উকীল আঙ্গরেজ এলটি" অর্থাৎ সিপাহীর উকীল ইংরাজ রাজদূত এই কথাটি প্রচলিত হয়।

লর্ড ওয়েলেসলির আমল থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে আরম্ভ করে। সিপাহীদের পুরোপুরি ইউরোপীয় অফিসারদের অধীনে এনে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার বশবর্তী করার চেষ্টা চলতে থাকে। এর বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং ১৮০৬ খৃস্টাব্দে মাদ্রাজের ভেল্লোর শহরে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে।

ক্রমে ক্রমে সিপাহীদের দেশজয়কালে দ্বিগুণ ভাতা দেওয়া, লুটের বখরা দেওয়া ইত্যাদি প্রথা লোপ করা হয়। এইভাবে সিপাহীদের বিশেষ সুবিধা, বিশেষ অধিকার লোপ পেতে থাকে, অসন্তোষের আগুনও দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

এর উপর ইংরাজ শাসকদের সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা আগুনে ইন্ধন যোগাল। সিপাহীরা মনে করল ইংরাজরা সুকৌশলে তাদের ধর্মনাশ করার চেষ্টা করছে। আগুন জ্বলছিল। টোটার ব্যাপারটা সেই আগুনকে প্রবল বেগে ছড়িয়ে দিল। সিপাহীদের প্রচারের পাঁচটি উপায় ছিল : (১) চাপাটি—কোন লোক চাপাটি পেলে বুঝত উদ্দেশ্য সিদ্ধির সব কিছু যোগাড় হয়েছে, এখন কাজ শুরু করার সময়। "খাই চাপাটি, লেও লাঠি" অর্থাৎ চাপাটি এল এবার লাঠি ধর।

(২) পদ্মফুল—বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হত। যাঁর কাছে পদ্মফুল পাঠানো হত তাঁর কানে কানে এই হিন্দী ছড়াটি আবৃত্তি করা হত "কই কাহুমে মগন, ম্যায় ওয়াহীমে মগন" অর্থাৎ অন্য কেউ যাতে তাতে মগ্ন থাকতে পারে, কিন্তু আমার মনপ্রাণ এতেই মগ্ন আছে। পদ্মফুল স্বাধীনতার প্রতীক—এর অর্থ হল শুভদিন এসেছে এইবার অগ্রসর হও।

(৩) হাড়ের মালা—ফকীর, দরবেশ, সন্ন্যাসী ও সাধুদের মধ্যে বিতরণ করা হত। এর অর্থ—পার যদি তোমার অধীন অথবা তোমার নিকটবর্তী সকল মানুষকে একভাবে ও একমতে মালারূপে গাঁথ।

(৪) জলের আধার—তামার একটি পাত্রের মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকত। যিনি এটা বহন করতেন তাঁর দু'হাতে কাচের চুড়ি পরা থাকত। এর অর্থ বন্ধন কাচের চুড়ির মত, এক আঘাতেই চুর্ণ হবে আর পাত্রের ছিদ্র পরাধীনতার ছিদ্র, কিন্তু সামান্য এই ছিদ্র অনায়াসে বন্ধ করা যাবে।

(৫) আশীর্বচন—ব্রাহ্মণ অথবা মওলানারা আশীর্বচন বহন করে নিয়ে যেতেন। নানা সাহেব, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ এবং সম্রাট বাহাদুর শাহ আশীর্বচন গ্রহণ করেছিলেন। আশীর্বচনের সঙ্গে একটি মন্ত্র পাঠ করা হত। তার অর্থ এই যে, মৃত্যুই অতীত গৌরবকে ভবিষ্যতের শ্লাঘার সহিত সংযুক্ত করে, সুতরাং মৃত্যুপণ করে তুমি স্বকার্য সাধনে তৎপর হও।

সিপাহীদের উৎপত্তির ইতিহাস এবং তাদের অসন্তোষের কারণ বর্ণনা করে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই লিখেছেন : "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস একখানি অতি ভীষণ বিয়োগান্ত নাটক। ইহার ঘটনা সঙ্গতি সম্পূর্ণ দৈবাধীন হইলেও, ইহার ফলপ্রাপ্তির ভীষণতায় ভারতবাসীকে এখন পর্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইয়াছে। ইহার উদ্ভব অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং ভয়ে। ইহার বিস্তার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থবিরতা হেতু। ইহার পরিণতি ইংরাজ বণিক সম্প্রদায়ের পশুত্বেই পরিস্ফুট হইয়াছে।" (পৃঃ ২৫)

মহা বিদ্রোহের কারণ

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "সিপাহী যুদ্ধের প্রাকালে তিনটি কারণে ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে একটা বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল।"

প্রথম কারণ ভূমি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্তের প্রভাবে দেশের পুরাতন অভিজাতবর্গ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পথের ভিখারী হলেন এবং "নূতন ও আধুনিক নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণ ধনী ও ভূসম্পত্তিশালী হইয়া প্রজাবর্গের উপর উৎপাত উৎপীড়ন আরম্ভ করেন।"

দ্বিতীয় কারণ, রেল ও টেলিগ্রাফের বিস্তার। রেল লাইন ও টেলিগ্রাফের তার বসাতে গিয়ে বহু লোককে তাদের পৈতৃক ভিটা ও জমিজমা থেকে উৎখাত করা হয়েছিল, অত্যাচার উৎপীড়নও কম হয়নি। এই সমস্ত বিক্ষুব্ধ লোককে কিছু লোক বুঝাল যে, রেল ও তার থাকায় কোম্পানীর ফৌজ রাতারাতি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারবে। এতে উপদ্রব বাড়বে।

তৃতীয় কারণ, বিদেশীদের অত্যধিক প্রভাব-প্রতিপত্তি।

বাঙালী ছাড়া এ সময় ভারতের অন্য কোন জাতি ইংরাজী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেনি। ফলে শাসন পরিচালনার ব্যাপারে শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরাজদের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়।

"এই সকল বাঙ্গালী বিদেশে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাতেই গিয়াছিলেন এবং কিসে তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জন পর্যাপ্ত পরিমাণ হয়, সে পক্ষেও তাঁহাদের দৃষ্টি তীব্র ছিল। কোম্পানীর অধীনে উচ্চপদ প্রাপ্ত হওয়ায় এই সকল বাঙ্গালী পাঞ্জাবে এবং পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বড় বড় সর্দ্দার এবং মহারাজা ও রাজার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইংরাজ অপেক্ষা ইহাদের জ্বালা—এই বালির তাপ অযোধ্যা ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অভিজাতবর্গের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তাঁহারা ব্যঙ্গ করিয়া বাঙ্গালীকে 'আঙ্গরেজকা গুরু' বলিতেন।"

ইংরাজী শিক্ষা, ইংরাজী সভ্যতার প্রভাবে এবং ইংরাজ শাসকদের বিধিব্যবস্থায় পুরাতন সমাজ ভেঙ্গে যাবে দেখে হিন্দু মুসলমান সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। মুসলমানদের বড় বড় খানদানি পরিবার পথের ভিখারী হয়ে গেল, শাসকজাতি হিসাবে মুসলমানদের যে মান-মর্যাদা ছিল তা লুপ্ত হয়ে গেল। ফলে, হিন্দু-মুসলমান মরিয়া হয়ে উঠল। "ইংরাজের আগমনে ভারতের হিন্দু মুসলমানের যাহা চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইল, যাহা আসিবার নহে, তাহাকেই পাইবার আশায় —সেই সুবিন্যস্ত সমাজকে আবার যথাস্থানে অধিষ্ঠিত করিবার আশায় সিপাহী যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল। ভারতের হিন্দু মুসলমান জাতিগত, দেশগত, সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ-বৈষম্য লইয়া এতদিন ইংরাজের অভ্যুত্থান লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু লর্ড ডালহাউসীর শাসনকালে যখন কুমারিকা হইতে হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গ পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষকে তাঁহারা এক শাসন শৃঙ্খলায় সংবদ্ধ দেখিলেন, তখনই ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান প্রবঞ্চিতের ন্যায়—অপহৃতের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া নষ্ট সামগ্রী উদ্ধারের জন্য শেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।" (পৃঃ ১১২-১১৩) এইভাবে "দেশ, কাল ও পাত্র সিপাহী যুদ্ধের অনুকূল" হয়েছিল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সিপাহী

যুদ্ধের হেতু এবং অনুকূল অবস্থার বর্ণনা করার পর বলেছেন, "১৮৫৭ খৃস্টাব্দ ভারতবর্ষের ভাগ্যের মহামুহূর্ত মনে করিয়া ভারতবাসী পরিবর্ত্তনের অজ্ঞেয়তার মধ্যে অচল জ্বালা জুড়াইবার উদ্দেশ্যে সিপাহী যুদ্ধের দাবদাহ সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা বিধাতার প্রেরণাও বলিতে হইবে, জাতির কর্ম্মফলও বলিতে হইবে।" (পৃঃ ১১৫)

'যুদ্ধারম্ভ' খণ্ডে ব্যারাকপুর, মীরাট, দিল্লী ও পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ও যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সিপাহীরা দিল্লীতে অকারণ নরহত্যা ও উৎপীড়নে ব্যস্ত থেকে দিল্লী রক্ষার সুব্যবস্থা করতে পারেনি। ক্ষুব্ধ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্য সিপাহীদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, "স্বাধীনতালিপ্স ও ধর্মভীরু হইলে সিপাহীগণ স্বেচ্ছাচারের প্রথম উল্লাসে নরঘাতকের আচার করিত না।" (পৃঃ ১৭৮)

মাহেন্দ্রক্ষণ অতিবাহিত হয়েছিল, বিয়োগান্ত নাটকের পূর্বলক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল দিল্লীতেই। তাই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "....সিপাহীগণ মহেন্দ্রক্ষণ পাইয়াও বুদ্ধির জড়তাবশতঃ কেমন অনায়াসে সে ক্ষণকে অতিবাহিত হইতে দিয়াছিল। যাহারা চিরকাল আদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়াছে, তাহারা সহসা স্বীয় বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে পারে না।" (পৃঃ ১৭৯) 'যুদ্ধারম্ভ' খণ্ডের পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত দিল্লীর যুদ্ধেরই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সিপাহীদের সম্বন্ধে পঞ্চম পরিচ্ছেদের উল্লিখিত মন্তব্য করার পরও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের অপূর্ব বীরত্ব ও আত্মত্যাগের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে দ্বিধা করেন নি, একান্ত ক্ষোভে বলেছেন, "দুইমাস পূর্ব্বে এমন বীরত্ব, এমন আত্মত্যাগ দেখাইতে পারিলে সিপাহীর দল ইংরাজের অবস্থানকে বিধ্বস্ত করিয়া ইংরাজ বাহিনীকে ধূলিসাৎ করিতে পারিত!" (পৃঃ ২৫২) "পরাজয় ও সর্বনাশের মুখে" সিপাহীরা যে "রণ চাতুরী ও রণ পাণ্ডিত্য" দেখিয়েছিল তার উল্লেখ করে ব্যর্থতার ক্ষোভে অধীর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন "দিল্লীর সিপাহীদিগের উপর কুমার সিংহের ন্যায় একজন

অমিততেজা অসাধারণ বীরপুরুষ যদি সেনাপতি হইতেন, তাহা হইলেও কোন গোল থাকিত না। অথবা, বখত খাঁ নিজে সুবাদার মেজর না হইয়া যদি একজন জমিদার পুত্রও হইতেন, তাহা হইলে তিনি অনেক কাজ গুছাইয়া লইতে পারিতেন অথবা কানপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নানা ধুন্ধুপন্থ বা টাঁটিয়া টোপী যদি দিল্লীতে যাইতেন তাহা হইলেও দিল্লীর পরিণতি স্বতন্ত্ররূপ হইত। ...যোগ্য নেতার অভাবে দিল্লী মাথা তুলিয়াও সুরারাগপ্রমত্ত লম্পটের ন্যায় আবার ধুলায় লুটাইল।"

"ইহাকে বিধাতার বিধান না বলিলে আর কি বলিব ? অথবা বলিব না কি যে, ইহা নিয়তির বিদ্রূপ ? নহিলে এমন পরিণতি ত' হইবার নহে।" (পৃঃ ২৫৩) দেশ-কালের প্রভাবে পাত্রের অর্থাৎ যোগ্য নেতার উদ্ভব কেন হল না এই প্রশ্নের জবাব দিতে যেয়ে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে সিপাহীযুদ্ধে "ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থের ক্লেদ কর্দ্দম" রয়েছিল বলেই "ভারতবাসী সর্ব্বত্রই উত্তেজিত হয় নাই।"

..."যাহা হইবার নহে তাহা হইতে নাই বলিয়াই হয় নাই।"

সিপাহীদের পরাজয়ের বিস্তারিত কাহিনী এবং ইংরেজদের বিজয়ের কাহিনী লেখার সুযোগ আর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পাননি।

ইংরাজের জয় ও সিপাহীদের পরাজয় বিধাতার বিধান বলে ঘোষণা করলেও 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের' প্রথম খণ্ডে বিদ্রোহের প্রতি তাঁর যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের তা উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় নি। ফলে বইটি বাজেয়াপ্ত হয়।

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা সম্ভবতঃ এখনও তৈরী হয়নি। তবু ১৯৫৭ সালের ২৯শে এপ্রিল এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে মহাবিদ্রোহ সংক্রান্ত প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত যে তালিকাটি হাতের কাছে রয়েছে তার মধ্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঠিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটির নাম পাইনি :—

১। লর্ড রবার্টস্-এর 'ফরটি-ওয়ান ইয়ারস ইন ইণ্ডিয়া', (২) স্যার জন হোপ গ্র্যান্টের 'সিপয় ওয়ার', (৩) মার্টিনের 'ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার', (৪) টেলরের 'পাটনা ক্রাইসিস', (৫) হজসনের 'টুয়েলভ ইয়ারস ইন ইণ্ডিয়া', (৬) আর্টিবল্ড ফরবেসের 'লাইফ অফ হ্যাভেলক।'

শুধু ইংরাজ লিখিত ইতিহাসের উপর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ভর করতে চাননি, ফরাসী লেখকদের ইতিহাস এবং 'সাস্তাওন কা গদর' প্রভৃতি হিন্দি পুস্তক থেকে "সিপাহী যুদ্ধের অনেক নূতন কথা" প্রকাশ করবেন বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এমন একটি মূল্যবান ইাতহাস সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের হস্তক্ষেপের ফলে আর সম্পূর্ণ হতে পারেনি।

পরিশিষ্ট

(১) ভোলানাথ চন্দ্র

অধুনা-বিস্মৃত উনিশ শতকের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ভোলানাথ চন্দ্র ভারতীয় মহাবিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন, এই কথাটাই সাধারণতঃ জোর গলায় প্রচার করা হয়ে থাকে, কিন্তু ইংরেজের চাকুরীজীবী বাঙালী মধ্যবিত্তের সম্পর্কে তিনি সেই মহাবিদ্রোহের যুগেও যে নিতান্ত হীন ধারণা পোষণ করতেন এবং মহাবিদ্রোহের কয়েক বৎসরের মধ্যেই বৃটিশ শাসনের সুফল সম্পর্কে তাঁর সম্পূর্ণ মোহমুক্তি ঘটেছিল এ কথাটি চেপে যাওয়া হয়। এই কারণেই উনিশ শতকের বঙ্গবাসী বুদ্ধিজীবীদের নেতৃস্থানীয় ভোলানাথ চন্দ্রকে বিশেষভাবে স্মরণ করা এবং তাঁর রচনা-বলীর পর্যালোচনা করা অত্যাবশ্যক। "সিপাহী বিদ্রোহ একটা মারাত্মক ভুল এবং এতে করে দেশ আবার অতীত যুগের কুশাসনে নিমজ্জিত হয়। এতে ভারতবর্ষের একান্ত প্রয়োজনীয় স্বার্থ বিপন্ন হয় এবং প্রমাণিত হয় (was to have proved) এই বিদ্রোহ তার ভাগ্যে আত্মহত্যার তুল্য হয়েছে। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবন লাভের যে পথ গড়ে উঠছিল ইংরেজ চলে গেলে তা নষ্ট হয়ে যেত" (পৃঃ ৩৭৩-৩৭৪)। এই কারণেই বিদেশী শাসন মেনে নেওয়াতে কোন বাধা নেই বলে ভোলানাথ মনে করেছিলেন। ভারতবাসী বিংশ বা একবিংশ শতকে কলকারখানা ও খনির মালিক হবে, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করবে, সমুদ্রপথে জাহাজে করে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য করবে—এই ভবিষ্যদ্বাণী ভোলানাথ করে গেছেন। (পৃঃ ১৬৯)। ভোলানাথ চন্দ্রের লেখা প্রথমে কলকাতায় 'স্যাটারডে ইভনিং ইংলিশ-ম্যান' পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ব্যবসায় উপলক্ষে এবং

নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ১৮৪৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভোলানাথ বাংলা দেশ ও উত্তর ভারতের নানা স্থানে পর্যটন করেন। ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত ডায়েরী বা দিনলিপিজাতীয় রচনাবলীই পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়।

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে ভোলানাথ তাঁর গ্রন্থে যে সব মতামত ব্যক্ত করেছেন সেগুলি উল্লেখযোগ্য।

ভোলানাথ চন্দ্র (১৮২২-১৯১০) সুবর্ণবণিক সমাজের নেতৃস্থানীয় লোক। উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে ভোলানাথ বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনের অন্যতম ছাত্ররূপেই ভোলানাথ ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হন। ভোলানাথের লেখা 'The Travels of a Hindoo to various parts of Bengal and Upper India.' (২ খণ্ডে প্রকাশিত) একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ভারতের ইতিহাস প্রণেতা জে, ট্যালবয়েড হুইলার গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন। ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে লণ্ডনের এল, ট্রুব্‌নার এণ্ড কোং কর্তৃক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ভোলানাথ তাঁর গ্রন্থ উৎসর্গ করেন তৎকালীন বড়লাট স্যার জন লেয়ার্ড মেয়ার লরেন্সকে।

ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষের উন্নতি হবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস ভোলানাথের ছিল। ক্রমে ভারতবাসী শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত না হওয়া পর্যন্ত "বিশুদ্ধতম আর্যবংশোদ্ভূত সম্রাটের অধীনে বৃহত্তম ও অতি গৌরবময় সাম্রাজ্যগুলির অন্যতম সাম্রাজ্যের অংশরূপে তার দেশ থাকুক, এর চাইতে অধিক কি কামনা একান্ত দেশপ্রেমিক হিন্দু করতে পারে?" —এ হল ভোলানাথের মত। এই দিক থেকেই তিনি ভারতীয় মহাবিদ্রোহকে বিচার করেছেন এবং রায় দিয়েছেন। ভারতবর্ষের অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধির কথা ভোলানাথ কখনও ভোলেননি। তিনি ইংরাজদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখেছিলেন। স্যার উইলিয়ম জোন্স ও মিলের মত লোকেরা ভারতবাসীরা বর্বর ও নিরক্ষর বলে ইংরাজ

শাসকদের মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল তা দূর করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অন্যেরা শাসিতদের হেয় করে দেখানোর এবং শাসক ও শাসিতদের মধ্যে ঘৃণার আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করেন। "ফলে সংকট দেখা দেয়, যা বিদ্রোহ এই ভয়ঙ্কর নামে অভিহিত।"

—(পৃঃ ২৮৭)

ভোলানাথ উত্তর ভারত পরিভ্রমণে বেরোন ১৮৬০ খৃস্টাব্দে। বারানসীতে বিদ্রোহকালে বাঙ্গালী-টোলায় বসবাসকারী প্রায় দশ হাজার বাঙ্গালীর যে দুরবস্থা হয় তার উল্লেখ করে ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঠিক চিত্রটি তুলে ধরতে ভোলানাথ দ্বিধা করেননি। অতীতে পাল সম্রাটদের যুগে বাঙ্গালীর গৌরবময় ইতিহাস সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভোলানাথ লিখেছেন :

"But the most glorious chapter in the history of the Bengalee has been quite forgotten. He is at present the most degenerate of all Indians. His country was regarded by the Moguls as little better than a Botany Bay—a backslum of India peopled by the worst of all men under the sun. The Hindoostanee would not condescend to own a nationality with him. He is particularly hated for aping the English, and was therefore hounded and hunted by the rebels with a peculiar malignity."

—(পৃঃ ২৮৯-২৯০)

মর্মানুবাদ—বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের ইতিহাস আজ বাঙ্গালী ভুলে গেছে। আজ বাঙ্গালী ভারতের সর্বাধিক নিকৃষ্ট জাতি। মুঘলরা বাংলা দেশকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখত। হিন্দুস্থানীরা বাঙ্গালীকে তাদের স্বজাতীয় লোক বলে মনে করে না। ইংরেজকে অনুকরণ করে বলে তাকে সকলে। বিশেষভাবে ঘৃণা করে এবং তাই বিদ্রোহীরা এক বিশেষ বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তাদের তাড়া করে ফেরে।

বাঙ্গালীদের ভীরুতার বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে ভোলানাথ বলেছেন : বাঙ্গালীরা যে কি ধাতুতে গড়া তা এতেই বোঝা যায়। তবু এই বাঙ্গালীরা বিদ্রোহে সহানুভূতি দেখিয়েছে এই অভিযোগ আনার জন্য হৈ চৈ করা হয়েছে। বাঙ্গালী চরিত্রই এই অভিযোগের সব-চাইতে ভাল জবাব। বিপদের সম্মুখীন হবার মত সাহস বাঙ্গালীর নেই।........."যে যুদ্ধের উপর তার নিজের ভাগ্য এবং তার জাতির ভাগ্য নির্ভর করছে সে যুদ্ধও সে নিরাপদ দূরত্বে থেকে লক্ষ্য করবে।"

নিজের গলা বাঁচানোটাই তার কাছে সব চেয়ে বড় কথা। তার সব চেয়ে পছন্দসই বচন হল 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' সে বেশ জানে যে, ইংরেজ যদি কোনদিন চলে যায় তবে তাকে 'বাঙ্গালীর আর্তনাদ' এই শিরোনামা দিয়ে বৃটিশ পার্লামেন্টের কাছে বাঁচানোর আবেদন জানিয়ে পত্র লিখতে হবে, বলতে হবে মুসলমান ও হিন্দুস্থানীরা তাদের তাড়া করছে। (পৃঃ ২৯০-২৯১)

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা' ছাড়া সে যুগের ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীদের নিয়ে এমন তীব্র ব্যঙ্গ বোধহয় আর কোন গ্রন্থে করা হয়নি।

এলাহাবাদের বাঙ্গালীদের কাছ থেকে বিদ্রোহের কাহিনী শুনে ভোলানাথ সিপাইদের অত্যাচারের কাহিনী যেমন বর্ণনা করেছেন তেমনি ইংরাজদের ভয়াবহ প্রতিহিংসা গ্রহণের কথাও বলতে ভোলেননি। বিদ্রোহীদের নানা দল এবং নানা বিষয়ে বিরোধ থাকায় তাদের জয়-লাভের কোন আশা ছিল না—এই মন্তব্য করার সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথ সামরিক আইনরূপ ভয়াবহ দানবের উল্লেখ করে বলেছেন : প্রাচ্যের দৈত্যদানবতত্ত্বে এই দানবের কথা স্বপ্নেও ভাবা হয়নি। দোষী নির্দোষী নির্বিশেষে এই দানব দেশের শত শত মানুষকে গ্রাস করেছে। হিন্দুদের কাহিনীতে উল্লিখিত রাক্ষসীকেও ধ্বংস সাধনের ব্যাপারে এই দানব ছাড়িয়ে গেছে।

—(পৃঃ ৩২০-৩২৪)

১৮৬৩ খৃস্টাব্দে ভোলানাথ যখন মুঙ্গেরে বাস করছেন তখন কয়েকজন লোকের চক্রান্তে তাঁর ব্যবসায় নষ্ট হয়ে যায় এবং ঐ বছরের আগষ্ট মাসে তিনি দেউলিয়া হয়ে যান। এই ঘটনা এবং নীলবিদ্রোহ ও অন্যান্য ঘটনাবলী ক্রমে ভোলানাথের চোখ খুলে দেয়। ইংরেজ শাসনে দেশের উন্নতি হবে বলে তিনি যে আশা এতদিন পোষণ করে আসছিলেন তা চূর্ণ হয়ে যায়। দেউলে হবার পর ভোলানাথ লেখা-পড়ায় মন দেন। এই সময় টাকা নিয়ে তিনি অন্যের ফরমায়েস মত লেখার কাজও করতেন। অবশ্য, এই সব ক্ষেত্রেও ভোলানাথ তাঁর স্বাধীন মতামত প্রকাশে কুণ্ঠিত হতেন না। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুরোধে তিনি এই সময় ইংরাজীতে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের একটি জীবন-চরিত রচনা করেন। এর জন্য দক্ষিণারঞ্জন ২৫০৲ টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জীবন-চরিত কিছুটা বিস্তারিত এবং সমালোচনামূলক হওয়ায় ভোলানাথ বেশী টাকা দাবী করেন। দক্ষিণারঞ্জন দ্বিগুন অর্থাৎ পাঁচ শ টাকা দিয়েছিলেন, কিন্তু জীবন-চরিতটি আর ছাপা হয়নি এবং পাণ্ডুলিপিটিও পাওয়া যায়নি। মনে হয়, দক্ষিণারঞ্জন ভোলানাথ রচিত তাঁর জীবন-চরিত প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন।

যাই হোক, ভোলানাথের স্বপ্নভঙ্গের পালা যে ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হবার কয়েক বছরের মধ্যেই সুরু হয়েছিল এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'মুখার্জিস্ ম্যাগাজীন' পত্রিকায় প্রকাশিত ভারতবর্ষের শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধগুলি ভোলানাথ হঠাৎ লেখেননি। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে কৃষ্ণমোহন মল্লিক 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব বেঙ্গল কমার্স' নামে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইংরাজ আমলে ভারতের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে এবং বাণিজ্য বাড়ছে এই ছিল এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। ভোলানাথ এই সিদ্ধান্ত মানতে রাজী হলেন না। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শম্ভুনাথের কাছে চিঠি লিখে জানালেন যে ভারতের শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে তিনি 'মুখার্জীস্ ম্যাগাজীনে' কিছু লিখতে চান। শম্ভুনাথ সানন্দে রাজী হন।

ভোলানাথ চন্দ্রের লেখা ধারাবাহিকভাবে ১৮৭৩ খৃস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে 'মুখার্জীস্ ম্যাগাজীনে' প্রকাশিত হতে থাকে। '১৮৭৩ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে 'উপক্রমণিকা', ১৮৭৩ খৃস্টাব্দের জুন ও ডিসেম্বর মাসে 'ভারতবর্ষের শিল্প ও বাণিজ্য (অতীত যুগ)' এবং ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে ও ১৮৭৬ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী থেকে জুনের মধ্যে 'ভারতবর্ষের শিল্প ও বাণিজ্য (বর্তমান যুগ)' প্রকাশিত হয়। 'মুখার্জীস্ ম্যাগাজিন' উঠে যাওয়ায় 'ভবিষ্যৎ যুগ' বা প্রবন্ধের শেষ পরিচ্ছেদটি প্রকাশিত হয় নি।

উপক্রমণিকায় ভোলানাথ চন্দ্র দেখান যে, সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার উল্টাটাই ঘটছে। বাণিজ্যলব্ধ অর্থের বেশীর ভাগ বিদেশে চলে যাচ্ছে এবং দেশবাসী দিন দিন দরিদ্র হচ্ছে। এখন সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন না করলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস অনিবার্য। ইয়োরোপীয় বণিকরা টাকা রোজগারের জন্যই এদেশে এসেছেন, কাজেই দেশের আসল অবস্থা যে তাঁরা প্রকাশ করবেন না এ আর বিচিত্র কি? মতিলাল শীল, স্যার জামসেদজী জিজিভাই প্রমুখ দেশীয় ধনীরা টাকা উপার্জন করেন, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে সমগ্র জাতিকে কি ভাবে উন্নত করা যায় এ বিষয়ে তাঁরা চিন্তা করেন না।

ভোলানাথ তাঁর এই প্রবন্ধে কৃষ্ণমোহন মল্লিকের ভুল দেখিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন।

ভোলানাথের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে শিক্ষিত সমাজে সাড়া পড়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র শম্ভুচন্দ্রকে লেখেন, "বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রবন্ধটি সাগ্রহে পড়েছি। লেখক কি ভোলানাথ চন্দ্র?"

শম্ভুচন্দ্র নিজে ভোলানাথ চন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন:

"Our countrymen must be dead to all sense of duty to their nation if they are not roused by your statement to demand justice in the distribution of office and in comercial legislation from their rulers."

(৯ই এপ্রিল ১৮৭৩)

মর্মানুবাদ :—শাসকদের কাছ থেকে পদ এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত আইনের ব্যাপারে ন্যায় বিচারের দাবি করার জন্য দেশবাসী যদি আপনার বিবৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়, তাহলে বলতে হবে তাদের কর্তব্যের চেতনা অসাড় হয়ে গেছে।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভোলানাথকে অভিনন্দন জানিয়ে ও গৌরদাস বসাকের নিকট লিখিত পত্রে ভোলানাথ কৃষ্ণমোহন মল্লিকের সমালোচনা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। গৌরদাস এতে রাজেন্দ্র-লালের উপর খুসী হননি। ভোলানাথের কাছে লিখিত এক পত্রে ঐ বিষয়ের উল্লেখ করে তিনি লেখেন :

"The fact is the natural kowtowing of our caste, I mean Bengali caste—both in action and opinion—pervades all ranks and grades of society. Your eyeglass is of different pebble and will not suit all people's sight."

মর্মানুবাদ :—আমাদের বাঙ্গালীদের সেলাম ঠুকে চলার অভ্যাস সমাজের সমস্ত স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে—এই হল আসল কথা। আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সকল লোকের দৃষ্টিভঙ্গী মিলবে না।

ভোলানাথের প্রবন্ধ নিয়ে সারা ভারতে হৈ চৈ পড়ে যায়। ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকাগুলি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কৃষ্ণমোহন মল্লিক শম্ভু-চন্দ্রের কাছে এক প্রতিবাদ-প্রবন্ধ পাঠান। তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে কৃষ্ণমোহনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেও শম্ভুচন্দ্র তাঁর মত মেনে নিতে পারেননি।

১৮৭৩ খৃস্টাব্দে ১৪ই মার্চ ভোলানাথ চন্দ্রের নিকট লিখিত এক পত্রে শম্ভুচন্দ্র কৃষ্ণমোহন সম্পর্কে লেখেন :

"......he is decidedly the European merchant's and manufacturer's man. I do not sympathise with the tone of his article—with his politics in fact".

অর্থাৎ লোকটি স্পষ্টতঃই ইয়োরোপীয় বণিক এবং কারখানার মালিকদের লোক। এঁর প্রবন্ধের সুরের সঙ্গে প্রকৃত পক্ষে এঁর রাজনীতির সঙ্গে আমি সুর মেলাতে পারি না।

ভোলানাথ চন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তিতে ভারতের অতীত যুগে শিল্প-বাণিজ্যের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বর্ণনা করে উপসংহারে বলেন:

"To strip naked the disguised truth, the English want to reduce us all to the condition of agriculturists. It would be impolitic for them to rear up great or rich men among us. They are afraid of the consequences of intelligence and wealth in our nation. Hence the dust thrown into our eyes. England's boast as a manufacturing power would be at an end, if India followed her own trades and industries.

Hence the persistent dissemination of the opinion that India's appointed vocation is agriculture."

মর্মানুবাদ:—গোপন সত্যটিকে নগ্ন করে ধরলে জিনিসটা এই দাঁড়ায় যে, ইংরেজরা আমাদের কৃষিজীবীতে পরিণত করিতে চায়। আমাদের মধ্যে কোন বড়দরের অথবা সমৃদ্ধিশালী মানুষকে গড়ে তোলা তাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমাদের জাতির বুদ্ধিমত্তা ও সম্পদের যে পরিণতি ঘটতে পারে সে সম্পর্কে তারা ভীত। এই কারণেই আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া হয়েছে। যদি ভারতবর্ষ তার নিজের বাণিজ্যশিল্প পরিচালনা করে তাহলে পণ্যপ্রস্তুতকারী শক্তি হিসাবে ইংলণ্ডের দম্ভ চূর্ণ হয়ে যাবে। এই কারণেই কৃষিই ভারতের একমাত্র বৃত্তি—এই মতটিই ক্রমাগত প্রচার করা হয়েছে।

প্রবন্ধের তৃতীয় কিস্তিতে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করে ভোলানাথ ইংলণ্ডের বাণিজ্যনীতির তীব্র সমালোচনা করে লেখেন:

"It may be summarised as a policy wholly and purely of interest, and not of duty. At first prohibitive, next aggressive, then suppressive, it has at last become repressive—setting bounds to Native ambition for anything approaching commercial rivalry. In name, it advocates free trade. In fact, it upholds a gigantic monopoly. The whole history of that policy—of the changes introduced from time to time to mature, harden and set it in the mould in which it exists and works at the present day—cannot but leave on the mind the impression that selfishness, combined with insincerity, is the essential of all commercial legislation by England with reference to India, and that the break-up and repression of Indian Industry being the great object of that legislation, it has been the most efficient cause of the decay and ruin of Indian manufactures—which are now like a star whose light survives, though space no longer contains its substance."

মর্মানুবাদ :—ভারত সম্পর্কে ইংলণ্ডের নীতি নিছক স্বার্থ-প্রণোদিত। প্রথমে এই নীতি নিষেধাত্মক পরে আক্রমণাত্মক এবং তার পরে দমনমূলক ও শেষ পর্যন্ত পীড়নমূলক হয়ে পড়েছে। বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতবাসীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাকেও এইভাবে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এই নীতিতে মুখে বলা হয় স্বাধীন বাণিজ্যের কথা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নীতি এক বিরাট একচেটিয়া বাণিজ্যকে বজায় রাখে। এই নীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই ধারণাই হয় যে আন্তরিকতার অভাবের সঙ্গে স্বার্থপরতাই হল ভারত সম্পর্কে ইংলণ্ডের সমস্ত বাণিজ্যিক আইনের মূল কথা। এই আইনের মূল লক্ষ্যই হল ভারতীয় শিল্পকে চূর্ণ করে দেওয়া। এই আইন হল ভারতীয় শিল্প ধ্বংসের প্রধান কারণ।

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পর ১৫ বৎসর যেতে না যেতেই অনেক বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মত ভোলানাথ চন্দ্রেরও মোহভঙ্গ হয়েছিল, কিন্তু বৃটিশ শাসনের আসল চেহারাটিকে খুব কম বাঙালী বুদ্ধিজীবী এমন স্পষ্ট করে উপলব্ধি করেছিলেন।

(২) *কিশোরীচাঁদ মিত্র*

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে এবং ইংরেজ শাসকদের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে 'দি মিউটিনি, দি গভর্নমেণ্ট এ্যাণ্ড দি পিপ্‌ল্ অর দি স্টেটমেণ্টস অব দি নেটিভ ফাইডেলিটি' নামক গ্রন্থটি কে রচনা করেছিলেন তা এখনও স্থির করা সম্ভব হয়নি। কিশোরীচাঁদ মিত্র উক্ত গ্রন্থের লেখক বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন অনেকে মনে করছেন যে আসলে কৃষ্ণদাস পাল নিজের নাম গোপন করে ঐ গ্রন্থ লিখেছিলেন। এ নিয়ে এখনও যথেষ্ট আলোচনা ও বিতর্কের অবকাশ আছে। কিশোরীচাঁদই উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা এই মত মেনে নিয়ে কিশোরীচাঁদ সম্পর্কে মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 'কর্মবীর কিশোরীচাঁদ' অবলম্বনে এখানে সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করছি।

কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২-১৮৭৩) বাংলার খ্যাতনামা লেখক টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাই। উনিশ শতকের বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কিশোরীচাঁদ বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন। কিশোরীচাঁদ ছিলেন ডেভিডহেয়ার ও রিচার্ডসনের কৃতী ছাত্রদের অন্যতম। রাজনারায়ণ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় —এঁরা ছিলেন কিশোরীচাঁদের সতীর্থ বা সমসাময়িক।

১৮৪১ সালে শিক্ষাজীবন শেষ করে কিশোরীচাঁদ যখন জ্ঞানচর্চা ও

চাকরীতে মন দেন তখন রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফের প্রভাব তাঁর উপর বিশেষভাবেই পড়ে। সম্ভবতঃ তাঁর রাজনীতিক মতবাদ রেভারেণ্ড ডাফের প্রভাবেই গড়ে ওঠে।

১৮৪৫ সালের অক্টোবর মাসে 'ক্যালক্যাটা রিভিউ'তে কিশোরীচাঁদ রচিত রামমোহন রায়ের জীবনী দেশী বিদেশী বুদ্ধিজীবী মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এই সময় ডাঃ ডাফ 'ক্যালক্যাটা রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বাংলার তৎকালীন ডেপুটি গভর্ণর হ্যালিডে সাহেব কিশোরীচাঁদের লেখা পড়ে খুব খুসী হন এবং তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দিতে চান। এই সময় কিশোরীচাঁদ এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

সমাজ সংস্কারক ও লেখকরূপে এর আগেই তরুণ কিশোরীচাঁদ বেশ কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিশোরীচাঁদ নিজে উদ্যোগী হয়ে Hindu Theo-Philanthropic Society প্রতিষ্ঠা করেন। ডাঃ ডাফ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারীচাঁদ এই সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৪৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। "হিন্দু পৌত্তলিকতা বিনষ্ট করা এবং ঈশ্বর, পরলোক, সত্য ও সুখ সম্বন্ধে যুক্তিসম্মত ও উন্নত অভিমত প্রচার করাই" সমিতির উদ্দেশ্য ছিল।

কিশোরীচাঁদ কার্যব্যপদেশে অন্যত্র চলে যাওয়ায় এই সমিতি লোপ পায়।

পরবর্তীকালে ১৮৫৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কিশোরীচাঁদ তাঁর কাশীপুরের বাড়ীতে বাংলার সামাজিক উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে একটি সমিতি স্থাপনের জন্য একসভা ডাকেন। এই সভায় সমাজ উন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ-সমিতি নামে এক সমিতি গঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতির সভাপতি হন। কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের মধ্যে ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র, গৌরদাস বসাক, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল প্রভৃতি।

কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৮৪৪ খৃস্টাব্দের ১লা অক্টোবর সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে থিও-ফিলজফিক্যাল সোসাইটির যে বিবরণী প্রকাশিত হয় তা আরও প্রাঞ্জল ও বিস্তারিতভাবে কিশোরীচাঁদ বিবরণটির প্রথম প্রবন্ধে আলোচেনা করেন। এই প্রবন্ধ থেকে কিশোরীচাঁদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধের প্রশংসা করে ডাঃ ডাফ 'ক্যালকাটা রিভিউ' (১৮৪৪, ৩য় সংখ্যা) পত্রিকায় লেখেন ঃ রাজনীতিক "সংস্কার যে ভারতের ভ্রান্তি ও বিষম রোগসমূহের একমাত্র মহৌষধ, এইরূপ স্বপ্ন যাঁহারা দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ভয়ানক মতিভ্রম বোধহয় আর কাহারও ঘটে নাই এবং একজন শিক্ষিত হিন্দু কর্ত্তৃক এই সকল সঙ্কীর্ণ ও ভ্রান্তিজনক মতের আবিষ্কর্ত্তা এবং পোষকগণকে কিছু স্বাধীন ভাবে এইরূপ যথোচিত নিন্দিত হইতে দেখা কিছু আশ্চর্য্য ও আনন্দের বিষয়।"

(মন্মথনাথ ঘোষ কৃত অনুবাদ, কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র, পৃঃ ৫৪)

কিশোরীচাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের একাংশের যে তীব্র মতাবরোধ ছিল তা ডাঃ ডাফের লেখাতেই প্রমাণিত হয়। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা লোপ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ইত্যাদি ব্যাপারের উপরেই কিশোরীচাঁদ সব চেয়ে বেশী জোর দিয়েছিলেন। বহুবিবাহ প্রথা লোপ আন্দোলন কিশোরীচাঁদই সর্বপ্রথম সুরু করেন। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের ব্যাপারে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। বাংলা দেশের কৃষকদের অবস্থা ইংলণ্ডের জনসাধারণের গোচরে আনার জন্যও কিশোরীচাঁদ চেষ্টা করেন।

কিন্তু ইংরাজ শাসন ও সভ্যতার একান্ত অনুরাগী এই কিশোরীচাঁদ যখন যৎসামান্য রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি জানালেন তখনই তিনি শাসকগোষ্ঠীর বিষনজরে পড়লেন। ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সময় প্রতিহিংসাপরায়ণ ইংরাজদের সংযত করার উদ্দেশ্যে কিশোরীচাঁদ 'The Mutiny,

the Government and the people—By a Hindoo,' নামে এক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল : সিপাহী বিদ্রোহ সৈন্য সংক্রান্ত বিদ্রোহ-মাত্র, এতে দেশবাসী জনসাধারণের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। দেশবাসী রাজভক্তই আছে, কাজেই কয়েকজন নির্বোধ সিপাই-এর জন্য নির্দোষ দেশবাসীর উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করা অন্যায়। লর্ড ক্যানিং নাকি বইটির খুব প্রশংসা করে কিশোরীচাঁদকে এক পত্র দিয়েছিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ফল দাঁড়াল বিপরীত। ক্রুদ্ধ শাসকগোষ্ঠী কিশোরীচাঁদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং মতবাদকে আদৌ সহ্য করতে রাজী হলেন না। কিশোরীচাঁদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত সুরু হল। এই চক্রান্তের নায়ক ছিলেন তদানীন্তন পুলিস কমিশনার মিঃ ওয়াকোপ (Mr. Wauchope)। শ্বেতাঙ্গ পুলিস কমিশনার বনাম জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, কাজেই ফল পূর্বনির্ধারিত! যথারীতি কমিশন ইত্যাদির প্রহসনের পর কিশোরীচাঁদ কর্মচ্যুত হলেন। মাইকেল মধুসূদন ও হরিশ্চন্দ্র মুখার্জীর সমর্থন ও অনুপ্রেরণায় কিশোরীচাঁদ অনেক লড়াপেটা করেন। এতে অবশ্য, নরমপন্থী নেতা রামগোপাল ঘোষ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শ্বেতাঙ্গ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে অতটা তেজের সঙ্গে লড়াইটা তাঁর পছন্দ হয়নি। ভোলানাথ চন্দ্র লিখেছেন : " They (Madhu and Harish Mukherjee) advised him to ask for a commission. Ramgopal Ghosh very much condemned this step and lamented Kissory's mistake in taking no better advice than from two flaming young spirits,"

(মাইকেলের জীবনচরিত, যোগীন্দ্রনাথ বসু—পরিশিষ্ট)

১৮৫৯ সালের মার্চ মাসে বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর কাছে আবার আবেদন জানিয়েও কিশোরীচাঁদ ব্যর্থকাম হলেন। মহাবিদ্রোহের সময় স্বার্থসিদ্ধির জন্য 'দয়ার অবতার' ও 'মহাত্মা' ক্যানিং যে কিশোরীচাঁদের প্রশংসা করেছিলেন প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় তিনি আর সেই কিশোরীচাঁদের আবেদনে কর্ণপাত করার সময় পেলেন না। কৈফিয়ৎ

স্বরূপ বলা হল ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চান না।

'ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক' (God's will be done)—ক্ষুণ্ণ মনে কিন্তু দৃঢ় চিত্তে রোজনামচায় এই কথাটি লিখে কিশোরীচাঁদ দেশসেবা ও সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। কিছুকাল রাজা প্রসন্ননাথ এবং শিয়ার্শোল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ প্রসাদের কারবারের এজেন্ট-রূপে কাজ করার পর কিশোরীচাঁদ ১৮৫৯ সালের মে মাসে পাঁচ শত টাকা বেতনে 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড'-এর সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন।

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ক্রমে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৫৮ সালের ২৭শে মার্চ 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। জেম্‌স্ হিউম 'এবেল ইস্ট' (Abel East) এই ছদ্মনামে এই পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। রাজনীতিক স্তম্ভের অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন কিশোরীচাঁদ। জেম্‌স হিউম অবসর গ্রহণ করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়ায় স্বত্বাধিকারীরা কিশোরীচাঁদকেই সম্পাদক নিযুক্ত করেন। প্রথমে 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড'-এ খেলাধুলার খবরই বেশী থাকত এবং এর জন্য সামরিক বিভাগের অধিকাংশ ইংরাজ কর্মচারী পত্রিকাটির গ্রাহক হয়েছিলেন।

কিশোরীচাঁদের সম্পাদনায় 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' রাজনীতি-প্রধান পত্রিকায় পরিণত হয়। নীল বিদ্রোহের সময় 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর মত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড'-ও কৃষকদের সমর্থনে জনমত সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়তা করেছিল, তবে 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' নরমপন্থী ও সংস্কারকামী কাগজ ছিল। অ্যাসলি ইডেন টাকা নিয়ে 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড'-এ প্রবন্ধ লিখতেন। রাজনীতি-প্রধান কাগজে পরিণত হওয়ায় 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড'-এর ইংরাজ গ্রাহকদের সংখ্যা খুব কমে যায়, আবার কিশোরীচাঁদের নরমপন্থী রাজনীতিও বোধহয় বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা তেমন পছন্দ করতেন না, ফলে 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড'-এর আর্থিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকে। কিশোরীচাঁদ অন্যান্য কাজ করে অর্থার্জনে বাধ্য হওয়ায়

সম্পাদনার ক্ষেত্রেও অবনতি দেখা দেয়। ১৮৬৫ সালের ১৮ই মে 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

লেখক, বক্তা এবং তখনকার দিনের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম নেতারূপে কিশোরীচাঁদ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এতে তাঁর সরকারী চাকুরি হারানোর ক্ষোভ অনেকটা মিটেছিল। ইংরাজ শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়-অবিচারের অভিজ্ঞতা লাভ করেও কিশোরীচাঁদ ভোলানাথ চন্দ্রের মত ইংরাজ শাসকগোষ্ঠীর আসল চেহারা ধরতে পারেননি, ইংরাজ শাসনে তাঁর আস্থা অটুট থেকে গিয়েছিল। রাজনীতিক উন্নতির জন্য আন্দোলন অপেক্ষা সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের উপর তিনি আজীবন জোর দিয়েছিলেন। কিশোরীচাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধু হরিশচন্দ্রের যে মতবিরোধ ছিল তা হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৬১ সালের ২২শে জুন তারিখের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হরিশচন্দ্র সম্পর্কে লেখা তাঁর প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত করেছেন। এই প্রবন্ধটিতে একদিকে ইংরাজ শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ফুটে উঠেছে, অপরদিকে চরমপন্থী রাজনীতির প্রতি বিরাগও এতে সুপরিস্ফুট।

কিশোরীচাঁদ লিখেছেন:

"বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীতে কোনও প্রতিভাবান বা শিক্ষিত হিন্দুর জীবনের ঘটনা অসাধারণ বা বৈচিত্র্যময় হওয়া অসম্ভব। সামাজিক, রাজনীতিক ও সাময়িক উন্নতির পথ রুদ্ধ থাকায়, তাঁহাকে সচরাচর কলিকাতার কোনও অফিসে কেরাণীরূপে অথবা অত্যন্ত সৌভাগ্য থাকিলে, কোনও পরগণার বা মহকুমার তালুকদার বা সাবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে, কোনওক্রমে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। দেশের সকল প্রকার উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত হইয়া, তাঁহারা কেরাণীর ডেস্কে ও ক্ষুদ্র কাছারীতে উৎসর্গীকৃত শক্তিকে কোনও বিস্তৃত প্রদেশ শাসনের ক্ষমতায় বিকশিত করিতে পারেন না। যে প্রতিভা মহাত্মা আক্‌বরের সৈন্যগণকে বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রদান করিয়াছিল, এবং সাম্রাজ্যের

কোবাগার সম্ভবিলা। করিয়াছিল ; অবিশ্রান্ত লেখনী চালাইয়া, খাজানা আদায় করিয়া, অথবা চোর ধরিয়া, সে প্রতিভার স্ফুরণ অসম্ভব। সার্দ্ধ দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র হয়ত টোড্‌রমল্ল অথবা আবুল্ ফজ্‌ল্ হইতে পারিতেন।"

—[মন্মথনাথ ঘোষ কৃত ভাবানুবাদ,
কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ পৃঃ ২১২-২১৩]

হরিশ্চন্দ্রের মতবাদ বর্ণনা প্রসঙ্গে কিশোরীচাঁদ লিখেছেন :

"......দেশে রাজনীতিক নবজীবনের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি আপনাকে উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে যাহা কিছু মহৎ ছিল, যাহা কিছু অকিঞ্চিৎকর ছিল, সমস্তই তিনি একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত নিয়ত নিয়োজিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য যে সকল অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয়, তাহাই তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতেন। সেই সঙ্কল্প সিদ্ধিই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির পক্ষে বাধা প্রদান করিতেন, তাঁহারাই তাঁহার শত্রু ছিলেন। যদিও তিনি সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন না, তথাপি (আমাদিগের বোধহয়, তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন) রাজনীতিক অবস্থার উন্নতির অসাধারণ কার্য্যকরী শক্তিতে আস্থাবান ছিলেন। এই জন্য তিনি তাঁহার দেশবাসীগণের মধ্যে রাজনীতিক নবজীবন সঞ্চারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি সর্বদা প্রকাশ্যভাবে এই ভাব ব্যক্ত করিতেন। আমাদিগের স্মরণ হয়, একদা আমাদিগের ভবনে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবৃত্ত রেভারেণ্ড ডাক্তার ডফের সাক্ষাতে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস যে, কেবলমাত্র রাজনীতিক উন্নতির দ্বারা আমাদিগের দেশে নবজীবন সঞ্চাররূপ মহাকার্য সংঘটিত হইতে পারে না। আমরা অস্বীকার করি না যে, ন্যায়সঙ্গত রাজনীতিক অধিকার লাভ দেশকে সঞ্জীবিত করিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় (যথা,— যে সকল রাজনীতিক ক্ষমতার অভাবে দেশ শক্তিহীন, সেই সকল

অভাব মোচন কর, দেশবাসীকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ প্রদান কর ; মহারাজ্ঞীর ঘোষণাপত্রের সাধু সঙ্কল্প পূর্ণ কর)। কিন্তু রাজনীতিক উন্নতির সহিত সামাজিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ না হইলে যথার্থ ভারতপ্রেমিকের আশা পূর্ণ হইতে পারে না।"

[মন্মথনাথ ঘোষ কৃত ভাবানুবাদ "'কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র' পরিশিষ্ট, পৃঃ ২১৮-২১৯]

(৩) *গিরিশচন্দ্র ঘোষ*

উনিশ শতকের খ্যাতনামা সাংবাদিকদের অন্যতম গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮২৯-১৮৬৯) ছিলেন মধ্যপন্থী। মোটামুটিভাবে তাঁকে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অনুবর্তী বলা যায় তবে হরিশ্চন্দ্রের দুঃসাহস তাঁর ছিল না। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এবং 'বেঙ্গলীর' সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতারূপেই গিরিশচন্দ্র সমধিক পরিচিত সাংবাদিক হিসাবেও তাঁর নাম স্মরণীয়। গিরিশচন্দ্রের পৌত্র খ্যাতনামা জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ (সম্প্রতি এঁর মৃত্যু হয়েছে) গিরিশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর একটি মূল্যবান সংকলন ১৯১২ সনে প্রকাশ করেন। 'Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose' নামে এই সংকলন গ্রন্থে মুখার্জীস ম্যাগাজিন, ক্যালকাটা মান্থলি রিভিউ, লিটারারি ক্রনিক্‌ল্‌, হিন্দু পেট্রিয়ট ও বেঙ্গলী পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি বক্তৃতাও এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি রচনা থেকে ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানা যায়।

১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ২১শে মে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দি মেট্রোপলিস এণ্ড ইটস সেফটি' প্রবন্ধে সিপাহী বিদ্রোহে

আতঙ্কিত কলকাতাবাসীদের নিরাপত্তার জন্য গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন।

কলকাতা ও কলকাতার আশেপাশে সিপাইদের মতিগতি সুবিধের নয় এই কথা বলে গিরিশচন্দ্র আপৎকালের জন্য প্রস্তুত থাকার উপদেশ দিয়েছেন, কারণ—

"Should Calcutta be for a single day in the hands of an insurgent soldier, the moral effect upon the country already excited as it is—would be much greater than if one of the provinces on the Indus were lost".

[Selection from the Writings of Grish Chunder Ghose. P.262]

তবে গিরিশচন্দ্র শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের দ্বারা গঠিত স্বেচ্ছাসৈন্য-বাহিনীর দ্বারা বিশেষ কিছু কাজ হবে না বলে মনে করেছিলেন, তাঁর মতে দেশীয় সিপাহী এবং অন্যান্য শ্রেণীর দুঃসাহসী লোকদের দরকার মত কাজে লাগানোর জন্য সংগঠন খাড়া করতে পারলে অনেক বেশী কাজ হতে পারে।

২৮শে মে তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত দি 'প্যানিক ইন ক্যালকাটা' বা 'কলিকাতায় আতঙ্ক' শীর্ষক প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র কলকাতার শ্বেতাঙ্গ ও ফিরিঙ্গি অধিবাসীদের ভয়ে পাগল হয়ে ওঠাকে বিদ্রূপ করেছেন।

গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :

"The state of feeling now exihibited by the notabilities of Chowringhee and their humbler satellites in Cossitollah is very much akin to that which drew the laughter of the world on the alderman of London and their militia when boney was a stalking horse in the imagination of the British people".

(P-264)

উত্তর প্রদেশগুলির লোকেরা বাংলা দেশের লোকের কাছে কোন সহানুভূতি পাবে না এবং বাংলা দেশের লোক সর্বতোভাবে সিপাইদের প্রতিরোধ করবে—সিপাইরা একথা জানে, অতএব যাঁরা জীবনে কখনও আগ্নেয়াস্ত্র দেখেননি তাঁরা নিজেদের খুন জখম করার চাইতে অস্ত্র পরিহার করলেই ভাল হয়—এই উপদেশ দিয়ে গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন। বিদ্রোহকালে কলকাতার নিরাপত্তা ব্যবস্থাপ্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। জমিদারদের খরচে দেশীয় পাইক বরকন্দাজদের হাতে অস্ত্র দেওয়ার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে গিরিশচন্দ্র ফিরিঙ্গি ও শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের (দেশীয় খৃস্টানদেরও এঁদের মধ্যে ধরা হয়েছে) হাতে অস্ত্র দেবার বিরোধিতা করেছেন। বাজীর আওয়াজ যাদের ঘুম কেড়ে নেয়, খানসামা ও খিদমৎগাররা মেরে ফেলবে এই ভয়ে যারা আড়ষ্ট—তাদের জন্য কিছু করা উচিত নয় এই বলে গিরিশচন্দ্র ফিরিঙ্গি ও শ্বেতাঙ্গদের প্রতি বক্র কটাক্ষ হেনেছেন। শ্বেতাঙ্গ ও ফিরিঙ্গিদের নিয়ে গঠিত 'ক্যালকাটা ভলান্টিয়ার গার্ডস্' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র বলেছেন 'বাঁদরের হাতে খন্তা দেওয়া'র চাইতেও এদের হাতে হাতিয়ার দেওয়া বুদ্ধিবিবেচনাহীনতার চরম নিদর্শন।

[There is a Bengali proverb, "Don't put a spade into the hands of a monkey". We believe that the putting of authority in to the hands of amateur soldiers, is much more flagrant act of imprudence.

[P-271]

মহাবিদ্রোহের ফলে আতঙ্কিত শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তদের মতিগতি সম্পর্কেও সন্ধিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। তাই আত্মরক্ষার জন্য শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তকে ইংরাজ রাজার প্রতি তার আনুগত্য প্রমাণের জন্য অনেক লড়াই করতে হয়। গিরিশচন্দ্র হরিশচন্দ্রের পদাঙ্কানুসরণ করে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের পক্ষ সমর্থন করেন। এ সম্পর্কে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুন 'হিন্দু

পেট্রিয়টে' প্রকাশিত 'দি সেপয় মিউটিনি এ্যাণ্ড ইটস্ অ্যাক্সন আপন দি পিপল অব বেঙ্গল' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধের বক্তব্য হ'ল : বাঙালী কখনও অস্ত্রধারণ করতে পারে না, তাদের কাজ ও কৃতিত্ব শুধুমাত্র অ-সামরিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ, তাদের শতমুখী তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করেছে, তারা জানে যে বৃটিশ শাসনই তাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী এবং তারা এও জানে যে, পরাধীন জাতিরূপে বৃটিশ শাসনেই তারা সর্বাধিক সমৃদ্ধি লাভ করবে। তারা আশা করে আইনও নিয়মতন্ত্রসম্মত উপায়ে বৃটিশ ন্যায়বুদ্ধির কাছে আবেদন জানিয়ে কালক্রমে উপযুক্ত সময়ে তারা দেশ শাসনের ক্ষেত্রে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে মর্যাদা ও দায়িত্ব সমানভাবে ভাগাভাগি করে নিতে পারবে। তারা ভারতের অন্যান্য সকল জাতির চাইতে ভালভাবে জানে যে বিগত হাঙ্গামায় দেশ কতটা পিছিয়ে গেছে। তবু মতলববাজ ও দুর্নীতিপরায়ণ কিছু লোক তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে—এটাই হল দুঃখের বিষয়। বলা হচ্ছে বাঙালীরা বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে। তারা সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট। এদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

(It has been insinuated that the Bengalees sympathise with the mutineers. That they are disaffected towards the Government. That they ought not to be trusted)

এই লোকগুলির বিদ্বেষের ও কুৎসা প্রচারের কারণ জানাই আছে। দেশীয় লোকেদের বিদ্যাবুদ্ধি ও সম্পত্তির প্রসারকে এই শ্রেণীর লোকেরা তাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের অসম্ভব দাবির পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ বলে জ্ঞান করে, তারা দেশীয় অধিবাসীদের অপদস্থ করতে চায়।

[The bureaucracy who find in the growth of intelligence and property among the natives of the country the geatest danger to their absurd claims to social pre-eminence are not unwilling to bring them into discredit. (p.267)]

১৮৫৮ খৃস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল লেঃ গভর্নর বা ছোটলাট মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের উপাধি ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে বক্তৃতা দেন সেই বক্তৃতা মে মাসের 'ক্যালকাটা মান্থলি রিভিউ'তে প্রকাশিত হয়। এই বক্তৃতার উল্লেখ করে গিরিশচন্দ্র 'দি মিউটিনি অ্যাণ্ড দি এডুকেটেড নেটিভ' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখেন। ক্ষিপ্ত ইংরাজদের প্রতিহিংসা-পরায়ণতায় উদ্বিগ্ন বাঙালী মধ্যবিত্ত লাটসাহেবের বক্তৃতায় নতুন উদার-নীতির আভাস পেয়ে খুশী হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের লেখায় বাঙালী মধ্যবিত্তের সেই খুশী ও স্বস্তির ভাব পরিস্ফুট।

গিরিশচন্দ্র তাঁর এই প্রবন্ধে মহাবিদ্রোহকে একেবারে তুচ্ছ ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"A simple strike among the army has been magnified into a national rebellion ; a wild hubbub has been raised about the disaffection generally of the Natives to the British rule ; and the whole vengeance of England called down on their devoted heads. Their peace has been menaced on every-side : and even their total extermination as a race has found favour in the eyes of a junto of mean and selfish agitators." (P. 111)

এই অবস্থায় 'জাতির আনুগত্য' (national loyalty)—অন্তত-পক্ষে শিক্ষিতদের (of the educated among them at all events) আনুগত্যের কথা সরকারীভাবে স্বীকার করে বাংলার লাট-সাহেব যে শিক্ষিত দেশবাসীদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—গিরিশচন্দ্র এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। লাটসাহেব তাঁর বক্তৃতায় বিদ্রোহকে মোটেই ছোট করে দেখান নি, বরং বিদ্রোহের ফলে বৃটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে তার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করেছেন। অবশ্য, গিরিশচন্দ্রের প্রবন্ধ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। তিনি

দেখাতে চেয়েছেন যে, বিদ্রোহদমনের ফলে শিক্ষিত ও কর্মকুশল ভারতবাসীদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ও প্রভুত্বলিপ্সু একদল ইংরাজ তাঁদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। সরকার এদের মতলবে সায় না দেওয়াতেই এরা ক্ষেপে গেছে।

প্রথমে বিদ্রোহকে 'সিপাইদের ধর্মঘট' মাত্র বলে উড়িয়ে দিয়েও পরে গিরিশচন্দ্র সিপাইদের বিদ্রোহের সঙ্গত কারণ ছিল বলে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে যাদের জীবন ও রক্তের বিনিময়ে শাসকগোষ্ঠী তাঁদের শাসন বিস্তার করেছেন তাদের যোগ্যতার উপযুক্ত পুরস্কার যদি দেওয়া হত, যদি শ্বেতাঙ্গ অফিসাররা তাদের প্রতি উদ্ধত ও দুর্বিনীত আচরণ না করত তা'হলে বিদ্রোহ কখনই সম্ভব হত না।

শিক্ষা-বিস্তারই ভারতবর্ষে ইংরাজদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে এক শ্রেণীর ইংরাজদের এই বদ্ধমূল ধারণার প্রতিবাদে লেঃ গভর্নর তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে বরং উল্টোটাই সত্যি। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত যারা তারাই বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি, বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। ছোটলাট যে উদ্দেশ্য ও ধারণা নিয়ে প্রতিবাদ করে থাকুন না কেন গিরিশচন্দ্র এই প্রতিবাদের সমর্থনে আরও অনেকদূর অগ্রসর হয়ে বলেছেন: শিক্ষা ও জ্ঞানের যে স্রোত প্রবাহিত হয়েছে তাকে কোনক্রমেই আর রোধ করা যাবে না। কোন অত্যাচার বা দমননীতির দ্বারা আদর্শ ও ভাবধারাকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়—এই হল ইতিহাসের শিক্ষা। ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষে শিক্ষা ও জ্ঞানের স্রোত আরও দ্বিগুণ শক্তিতে প্রবাহিত করে পরম গৌরবের অধিকারী হবে এই আশা প্রকাশ করে গিরিশচন্দ্র তাঁর এই প্রবন্ধ শেষ করেছেন। (পৃঃ ১১১-১১৮)

(৪) কৃষ্ণদাস পাল

“নেটিভ ফাইডেলিটির” লেখক কে ? কৃষ্ণদাস পাল কি ? এই প্রশ্ন আজ উঠেছে। কৃষ্ণদাস পাল, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের রচনাভঙ্গী বিচার করে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে কিনা বলা শক্ত, কিন্তু রাজনৈতিক জীবন ও চরিত্র বিচার করে বোধহয় রায় দেওয়া সহজতর। কিশোরীচাঁদ রাজনীতির উপর জোর দিতে চাননি, এমনকি ইংরেজ আমলাদের চক্রান্তে চাকরি হারিয়েও তিনি ইংরেজ-বিদ্বেষী হননি। অকপটভাবেই তিনি বিশ্বাস করতেন যে আগে সমাজ-সংস্কার করা দরকার, দেশবাসীকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তোলার দরকার। এই অকপটতা ছিল বলেই মনে হয় “নেটিভ ফাইডেলিটির” মত চাটুকারিতাপূর্ণ বই লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কৃষ্ণদাস পালের (১৮৩৮-১৮৮৪) অনেক গুণ ও ক্ষমতা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু দৈনন্দিন জীবন এবং রাজনীতি উভয়ক্ষেত্রেই কৃষ্ণদাস ছিলেন আজকের ভাষায় যাকে বলা হয় সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর সুবিধাবাদী চরিত্রের ছবি তাঁর জীবনীকাররাই এঁকে গেছেন।

কৃষ্ণদাস আলিপুরের জজের কাছারীতে অনুবাদকের পদ লাভ করেন। কেন যে তিনি পদচ্যুত হন তার কারণ জানা যায়নি। পরে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্ণধাররূপে জমিদারদের সেবা করে কৃষ্ণদাস জমিদারদের সুনজরে পড়েন এবং আর্থিক দিক থেকে বিশেষ লাভবান হন। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে তিনি পাকাপাকিভাবে মাসিক সাড়ে তিনশত টাকা বেতনে এসোসিয়েশনের সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি যেসব কাজ করেন তার উল্লেখ করে তাঁর জীবনীকার রামগোপাল সান্যাল তাঁকে “রাজনৈতিক ব্যূহচক্রের প্রধান চক্রী” বলে অভিহিত করেছেন। রামগোপাল সান্যাল স্পষ্টভাষায় লিখেছেন, “....কখনও কখনও লোকে তাঁহাকে জমীদারদিগের ‘বণেয়া’ লোক বলিয়া ঘৃণা করিত।”

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে কৃষ্ণদাস 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হন এবং পরে কৃষ্ণদাস নিজেই চক্রান্ত করে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'এর সংস্রব ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। সুযোগ বুঝে কৃষ্ণদাস কালীপ্রসন্ন সিংহকে দিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'কে ট্রাস্ট সম্পত্তিতে পরিণত করান। রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ কৃষ্ণদাস পালের পৃষ্ঠপোষকরা ট্রাস্টী হন।

"কি গুপ্ত অভিপ্রায়ে কৃষ্ণদাস এই কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই।" (হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের জীবনী—রামগোপাল সান্যাল (১৮৯০—পৃঃ ৩১)

অভিপ্রায় কি ছিল তা অবশ্য রামগোপালের অজানা ছিল না, তাই তিনি লিখেছেন, "....কৃষ্ণদাস আপনার বুদ্ধিবলে ক্রমে ক্রমে হিন্দু পেট্রিয়টের সমস্ত আয়ের জীবন-স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন।" (পৃঃ ৩৩) 'হিন্দু পেট্রিয়ট' থেকে কৃষ্ণদাস পালের বছরে বারো হাজার টাকা, অর্থাৎ মাসে হাজার টাকা লাভ হত।

কৃষ্ণদাস রক্ষণশীল ও প্রগতিবিরোধী ছিলেন। ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে কলিকাতার পৌরসভায় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনে তিনি ঘোর বিরোধিতা করেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে শিশিরকুমার ঘোষ ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তীব্র দ্বন্দ্ব হয়। রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন, "শ্রদ্ধেয় বাবু শিশিরকুমার ঘোষ (অমৃতবাজারের সম্পাদক) ও বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণদাসের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কলিকাতায় আত্মশাসন প্রণালীর প্রবর্তন করান।" (পৃঃ ৫৯)

কৃষ্ণদাস পালের সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র বিবেচনা করলে মনে হয় তাঁর মত লোকের পক্ষেই 'নেটিভ ফাইডেলিটির' মত গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। তাঁর সম্বন্ধে দেশবাসীর ধারণা ভাল ছিল না বলেই বোধহয় তিনি ছদ্মনামে বইটি প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্তের মূলে একটি নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যও পাওয়া গেছে। কৃষ্ণদাস পালের জীবনীকার রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন :

"On the suppression of the mutiny, when the Anglo-Indian press headed by the Friend of India raised an outcry against the native loyalty Babu Kristo Das wrote a pamphlet called "Statements of Indian fidelity" under the nom-de-plume of "A Hindu" which was published in 1859".

(Life of the Hon'able Rai Kristo Das Pal Bahadur C.I.E.
—Ramgopal Sanyal (1886), P. 16)

অর্থাৎ বিদ্রোহ দমন করার পর যখন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র-গুলি 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র নেতৃত্বে ভারতবাসীদের আনুগত্যে সন্দেহ প্রকাশ করে চীৎকার জুড়লেন তখন বাবু কৃষ্ণদাস পাল "জনৈক হিন্দু" এই ছদ্মনামে "স্টেটমেণ্টস্ অফ ইণ্ডিয়ান ফাইডেলিটি" নামে এক পুস্তিকা লেখেন। পুস্তিকাটি ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

(৫) *হিন্দু পেট্রিয়ট*

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন বড়বাজার নিবাসী বাবু মধুসূদন রায়। মধুসূদন রায় তাঁর প্রেস থেকে একটি কাগজ বের করার কথা ভাবেন। তাঁর উদ্যোগেই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে যাঁরা চাকরি করতেন তাঁদের কাগজে লেখায় কোন বাধা ছিল না। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রথমে সম্পাদনা করতেন শ্রীনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং ক্ষেত্রচন্দ্র এই তিন ভাই। কেরানী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১) প্রবন্ধাদি লিখে এঁদের সাহায্য করতেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রকাশিত হবার তিন-চার মাস পরেই ঘোষভ্রাতারা কাগজের সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তখন কাগজ চালানোর সমস্ত দায়িত্ব হরিশ্চন্দ্রের ঘাড়ে পড়ে। হরিশ্চন্দ্র

স্বাধীনভাবে সাংবাদিক বৃত্তি অবলম্বনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হন। বহুকষ্টে কিছু টাকা জমিয়ে তিনি ১৮৫৫ খৃস্টাব্দের জুন মাসে তাঁর ভাইয়ের নামে 'ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টে'র স্বত্ব কিনে নেন। মহাবিদ্রোহের সময় কৃষ্ণদাস পাল 'হিন্দু পেট্রিয়টে' লিখতে শুরু করেন।

(৬) শেষকথা

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ যে সেকালের অনেক মানুষকে বিশেষ করে বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তার কিছু কিছু প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। আর একটি ছোট-খাট প্রমাণও এখানে দেওয়া যায়। খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২) তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন:

"সুহৃদ্বর কবি বিহারীলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অন্যতম লেখক হইলাম।…ঐ পত্রিকায় আমার দুইটি শ্লোকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল,—'জুঁইফুলের গাছ' ও 'তাঁতিয়া টোপী'।…৺কামাখ্যাচরণ ঘোষ, স্বপ্রণীত 'রত্নসার' নামক বাল্যপাঠসংগ্রহ গ্রন্থে ঐ দুইটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন; পরে কিন্তু 'তাঁতিয়া টোপী' কবিতাটি পাছে রাজভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়, এই ভয়ে সেটিকে বাদ দিয়াছিলেন।"…(পুরাতন প্রসঙ্গ ১৩২০ সাল) ডাঃ শীতাংশু মৈত্র তাঁর 'যুগন্ধর মধুসূদন' গ্রন্থে আচার্য কৃষ্ণকমলের লিখিত কবিতার উল্লেখ করে লিখেছেন:

"তাহা হইলে তাঁতিয়া টোপীর সমর্থনমূলক কবিতাও সেকালে প্রকাশিত ও জনগ্রাহ্য হইয়াছিল।" এরপর ১৮৭২ খৃস্টাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রশস্তিমূলক প্রবন্ধ,

কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা ও শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনার উল্লেখ করে তিনি বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের উপর মহাবিদ্রোহের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেননি, আবার দক্ষিণারঞ্জন, ঈশ্বর গুপ্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখের কথা ভেবে এই প্রভাবকে স্বীকার করতেও তাঁর মন চাইছে না। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "···বাঙালী এই বিদ্রোহকে মনে-প্রাণে সমর্থন করে নাই, একথা তথ্যবিরোধী।" ভূমিকায় এই কথা বলার পরেও বিস্তারিত আলোচনা করে ডাঃ মৈত্র লিখেছেন, "এই বিদ্রোহে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী সিপাহীদের স্বপক্ষে ছিলেন না।" (যুগন্ধর মধুসূদন, পৃঃ ৪১) আরও পরে তিনি লিখেছেন, "মিউটিনির প্রতিকূলতা করেন নাই এমন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সেকালে প্রায় ছিলেন না বলিলেই চলে····।"

(ঐ পৃঃ ১০২)

এইভাবে ডাঃ মৈত্র নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় নিজেই কাঁচিয়ে দিয়েছেন, তবু মাইকেল মধুসূদনের সাহিত্যকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সেকালের বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উপর মহাবিদ্রোহের প্রভাব সম্পর্কে যে প্রশ্ন তুলেছেন তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

উপসংহারে শ্রীসজনীকান্ত দাসের কথা আবার একটু বলি। শ্রীসজনীকান্ত বরাবরই ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে কটুকাটব্য করে এসেছেন। কিন্তু কেন জানি না ইদানীং তাঁরও কিছুটা মতি পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়। ১৩৬৬ সালে 'দেব-দেউল' নামে প্রকাশিত দেবসাহিত্য কুটিরের ছোটদের একটি বার্ষিকীতে তিনি একটি গল্প লিখেছেন। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প 'দুরাশা'র জের টেনে সজনীবাবু কেশরলালের সঙ্গীকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখে এক ফরাসী পণ্ডিতের সংস্পর্শে এনে তাঁকে আধুনিক জাতীয়তা-বাদীতে পরিণত করেছেন। এও মন্দের ভাল, কারণ প্রকারান্তরে তিনি ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সূত্রটি এইভাবে গাঁথতে বাধ্য হয়েছেন।

উনিশ শতকে ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় যে সমস্ত ইংরাজী উপন্যাস বা গল্প বেরিয়েছিল সেগুলি নিয়ে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয় নি এবং করা সম্ভবও নয়। তবু রমেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশিচন্দ্র দত্তের (১৮২৪-১৮৮৫) Shankar, Tale of the Indian Mutiny নামক গ্রন্থের উল্লেখ না করে পারছি না। এ বইটি আমি খুঁজে পাই নি, তবে এটুকু জানি যে, দীনেন্দ্রনাথ রায় (১৮৫৯-১৯৪১) এই বইটি অবলম্বন করে 'নানা সাহেব' উপন্যাস রচনা করেছিলেন। 'নানা সাহেব' প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। ইতিমধ্যেই বইটি দুষ্প্রাপ্য হয়েছে।

শুধু ডাঃ শীতাংশু মৈত্র নন, অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র, জাতীয় গ্রন্থাগারের (কলিকাতা) সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরাও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও জনসাধারণের উপর ভারতীয় মহাবিদ্রোহের প্রভাব নানাভাবে স্বীকার করেছেন। এক কথায় বলা যেতে পারে সাম্প্রতিককালে ভারতীয় মহাবিদ্রোহের নতুন মূল্যায়নে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা পিছিয়ে নেই।

গ্রন্থপঞ্জী

স্বতন্ত্র গ্রন্থপঞ্জী যোগ করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ যে সব পুস্তক-পুস্তিকা বা পত্রিকাদির সাহায্য গ্রহণ করেছি সেগুলির নাম বই-এর মধ্যেই উল্লেখ করেছি। তবু কিছু কিছু বই ও পত্রিকার নাম বাদ পড়েছে বা বইয়ের মধ্যে দেবার সুবিধা হয় নি। এই সব বই ও পত্রিকাদির নামের তালিকা নীচে দেওয়া হল :—

১। **Economic History of Bengal—Vol 1—N. Sinha.**

২। **Trade and Finance in the Bengal Presidency (1793-1833) —Tripathe.**

৩। **Indo-British Economy—Nirmal Ch. Sinha.**

৪। ভারতের অর্থনীতিক বিকাশের ধারা—সুনীল সেন

৫। কলিকাতার কথা—প্রমথনাথ মল্লিক

৬। দেশ, ২৫ জানুয়ারী, ১৯৫৮—সাতান্ন বিপ্লবের ঐতিহ্য—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

৭। পরিচয়, চৈত্র, ১৩৬৩—আজি হতে শতবর্ষ পূর্বে—গোপাল হালদার

৮। পরিচয়, সিপাহী বিদ্রোহ স্মারক সংখ্যা—শ্রাবণ, ১৩৬৪